নীলকণ্ঠ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা চারি আনা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

উপন্যাসখানি ১৩৩৯ সালে উপাসনা মাসিক পত্রিকায়—ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল। তখন নাম ছিল যোগ-বিয়োগ। বর্ত্তমানে পুস্তকখানির বহু পরিবর্ত্তন হওয়ায় নাম দেওয়া হইল—নীলকণ্ঠ।

এই লেখকের অন্য বই

১। চৈতালী-ঘূর্ণী

দাম—১৲

২। পাষাণ পুরী

দাম—১৷৹

প্রিয় সুহৃদ্

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু—

প্রীতিমুগ্ধ

তারাশঙ্কর

আশ্বিন—১৩৪০

নীলকণ্ঠ

এক

বেলা যায়-যায়। অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিধারা আকাশের বুকে ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ গ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীর কোল হইতে অন্ধকার যেন ক্রমশঃ মাথা তুলিয়া উপরে উঠিতেছে। পল্লীপথ ধরিয়া একদল ছেলে কলরব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছিল। সকলেই সমান ভাবে চীৎকার করিয়া ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ প্রশ্ন-বর্ষণ করিতেছিল একটী ছেলের উপর।

অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়াছিল সপ্তরথী,—কিন্তু শ্রীমন্তের চতুষ্পার্শ্বে বহুরথীর সমবেত আক্রমণ। শ্রীমন্ত আর যাই হোক কাপুরুষ নয়,—সে সকল প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিতেছিল। পেয়ারা চুরী করিতে গিয়া শ্রীমন্ত ধরা পড়িয়াছে; বাবুদের বাগান যে-খোট্টাটা এবার জমা করিয়া লইয়াছে তাহার হাতে বেশ ঘা কতক খাইয়াছে।

শ্রীমন্তের একটীমাত্র জবাব সম্বল—*ধ'রে ফেল্লে ত' কি করব?*

রামকেষ্ট কহিল—তুই ত' গাছে গাছে চলে গিয়ে সব্বারই আগে বাগান পার হ'য়ে গেলি। তবে তোকে ধরে ফেল্লে কি ক'রে?

—কে যে পড়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠল। আমি ভাবলাম নসু পড়ে গিয়েছে। তাই ফের পাঁচীল ডিঙিয়ে বাগানে গেলাম—তা দেখি কেউ কোথাও নাই! পিছু থেকে—

—বাকীটা ধরা পড়ার লজ্জাকর ইতিহাস। সেটুকু বেচারার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ব্যঙ্গবিষে ঝাঁঝালো করিয়া সেটুকু বলিয়া দিল ওই নসুই—

—পিছু থেকে আগলদার এসে কঁ্যাক্ ক'রে ধরে ফেল্লে। শেয়াল যেমন ভেড়া ধরে—ঠিক তেমনি ক'রে, নয় রে?

বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ হাস্য-রোল আরও উদ্বেল উচ্ছল হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সকলের মুখপানে চাহিয়া থাকে; এতগুলা মুখ চাপা দিবার মত কিছুই বেচারা খুঁজিয়া পায় না।

হাসির বেগ ক্ষীণ হইয়া আসিলে বিপিন কহিল—তুই একটা ভ্যাবা-কান্তরে! সে ত মিথ্যে ক'রে চেঁচালাম আমি। নসু তখনও গাছ থেকে নামতে পারেনি—তাই বাগানের কোণে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মিথ্যে ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলাম। বেটা খোট্টা যেমনি এদিকে ছুটে এসেছে, অমনি নসুও গাছ থেকে নেমে পাঁয়বন্তি। আর মাঝখান থেকে ভ্যাবাগঙ্গারাম এসে নাড়ুগোপালের মত ধরা পড়লেন। আহা-হা।

আবার হাসির রোল আবর্তের মত ফেনাইয়া উঠিল, পরম কৌতুকে সবাই উপভোগ করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

চণ্ডীচরণ কহিল—আচ্ছা তুই বল্লি না কেন যে, বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম কে চীৎকার ক'রে উঠল। কেউ পড়ে গিয়েছে মনে ক'রে আমি দেখতে এসেছি—আমায় ধরবে কেন?

একটুখানি আমতা-আমতা করিয়া সে কৈফিয়ৎ দিল—

বাঃ দাঁতে যে পেয়ারার কুচী লেগেছিল—

—দস্ত বিকাশরে আমার! ধরা পড়বা মাত্রই বুঝি দাঁত মেলে বসেছিলেন?—ছি-মন্ত কিনা?

—নামেও ছি-মন্ত কাজেও ছিমন্তরে তুই!

—ছিমন্ত নয়রে—শ্রীমন্ত—কাণার নাম পদ্মলোচন!

শ্রীমন্ত এবার মরিয়ার মত একটা কৈফিয়ৎ দিল—ছি-মন্ত হই আর যাই হই,—তোদের নাম ত করি নাই আমি।

—নিজে ত মার খেলি।

এবার শ্রীমন্ত যেন একটা মনের মত জবাব পাইল; খুব একচোট তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া সে কহিল—লাগেই নাই আমাকে। সেই বেটা ছাত্তরই হাত ফুলে উঠবে দেখতে পাবি;—খাঁটী রক্ত জমে যাবে। বাবা এ পিঠে যিনি চাপড় মারবেন তিনিই ঠ্যালা বুঝবেন—হেঁঃ হেঁঃ—।

—না—মেলে আবার লাগে না!

—মাইরী বলছি—লাগে না। দেখেছিস ত, পণ্ডিত মেরে মেরে আর আমার পিঠে হাত ঠেকায় না। আর বিশ্বাস না হয় ত দেখ তোবা—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন সটান আসিয়া ঘা চার বসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন,—আর একজন,—আর এক-জন; মোট কথা বাকী কেহ রহিল না। যাহাকে বলে চাঁদা করিয়া মার, সেই মার শ্রীমন্তের পিঠে পড়িয়া গেল।

শ্রীমন্ত দাঁতে দাঁত টিপিয়া থাকে,—কোন ক্রমে বেদনা উপলব্ধির বিন্দু-মাত্র আভাষও প্রকাশ হইতে দেয় না। সকলের পরীক্ষা শেষ হইলে গোটা দুই দম লইয়া সে হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—ওস্তাদের মন্তর আছেরে। আর জানিস দম বন্ধ ক'রে থাকলে কিচ্ছু লাগে না।

পাথর কাঁদেনা বলিয়া মানুষ পাথরে চাপড় মারে না। চাপড় মারিয়া

অভিজ্ঞ মানুষ প্রবচন রচনা করিয়া গেছে—"পাথরে তুল'না হাত—পরাজয় নির্ঘাৎ।"

শ্রীমন্ত না কাঁদিয়া আজ জিতিয়া গেল ;—ছেলের দল এ উহার মুখের পানে চাহিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।

বেশ সদম্ভে কয় পা অগ্রসর হইয়া শ্রীমন্ত বিজ্ঞের মত কহিল—বাবা—গুরুমশায়ের কঞ্চি, বাবার পাঁচন, মায়ের হাতা, আর ওস্তাদের লাঠী প'ড়ে প'ড়ে পিঠ হয়েছে পাথর। ন'সে—দেখি তোর হাতটা। শুধুই কচলাচ্ছিস কেন, রক্ত জমেছে বুঝি? দেখি!—

মার খাইয়া শ্রীমন্ত বিজয়ীর মত চলিল।

রামকেষ্টর তাহা বোধ করি সহ্য হইল না, সে কহিল—

মার খেয়ে তোমার না লাগুক্, তোমাকে কিন্তু এই ধরা পড়ার জন্যে জরিমানা দিতে হবে। চুরী করতে গিয়ে যে ধরা পড়বে তাকেই কিন্তু জরিমানা দিতে হবে ; আমাদের দলে এই নিয়ম হ'ল আজ থেকে।

শ্রীমন্তের ইহাতে প্রবল আপত্তি, সে কহিল—বাঃ মারও খাব আবার জরিমানাও দেব। বাঃ। না ভাই—

রামকেষ্ট কহিল—বাঃ কি রকম,—জেলেদের দেখনি? মাছ চুরী ক'রে ধরা পড়লে সমাজে ওদের জরিমানা দিতে হয়।

—আমরা ত জেলে নই।

—জেলে না হই কেন? আমাদের ওই নিয়ম হবে। আচ্ছা ভোট হোক। কে কে আমার দলে হাত তোল।

উপস্থিত প্রাপ্তির আশায় সকলেই রামকেষ্টর দলে ঝুঁকিয়া পড়িল, সকলেই হাত তুলিয়া বসিল। ভোটযুদ্ধে পরাজিত শ্রীমন্তকে সমষ্টির রায় মানিয়া লইতে হইল।

শ্রীমন্ত বিষণ্নভাবে কহিল—আচ্ছা কি জরিমানা লাগবে বল।

রামকেষ্ট দলের সদস্য গণনা সুরু করিয়া দিল। গণনা শেষ হইলে সে কহিল—চৌদ্দ জনের চৌদ্দ আনা।

শ্রীমন্তের মুখ শুকাইয়া গেল, এই পয়সার জন্য তাহার যত বিপদ। পাঠশালায় পণ্ডিত ঠ্যাঙান্ পয়সার জন্য,—ছিদাম মুদীর দোকানের সম্মুখ দিয়া হাঁটিবার যো নাই এই পয়সার জন্য, পয়সা চাহিলে বাপ পাঁচন তুলিয়া মারিতে আসে, মা হাতার আঘাত বসাইয়া দেয়। আবার সঙ্গীরা চাহে পয়সা ?—

সে কহিল—না ভাই পয়সা টয়সা আমার নাই আমি বরং দু'টো হাঁস দেব তোমাদের।

রামকেষ্ট হিসাবী ছেলে—সে কহিল—মসলার দাম কে দেবে শুনি ? তুমি ত মুখুজ্জেদের হাঁস গেঁড়া মারবে।

বিপিন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে,—তার উপর একটু লোভী, সে কহিল—আমি দেব,—আমি দেব ; ছিমন্তে আনিস তুই হাঁস।

রামকেষ্ট কহিল—"এই বিপনে চুপ।"

পল্লীর বসতির মধ্যে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই হালদারদের মজলিস। তিন বুড়া সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া থাকে আর দাবা খেলে।

ছেলেরা সুট্‌সাট্ করিয়া এদিক ওদিক খসিয়া পড়ে, যে যাহার আপন আপন পথ ধরে। শ্রীমন্তও আপন বাড়ীর পথ ধরিল।

মাথার উপরে আকাশ এখনও স্বচ্ছ, পশ্চিম আকাশে শুধু একটী উজ্জ্বল তারা দেখা দিয়াছে। মাটীর বুকের উপর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। জনবিরল পল্লীপথে চলিতে চলিতে শ্রীমন্ত এতক্ষণে আপনার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইল। হাতের লবণাক্ত স্পর্শে পিঠটা জ্বালা করিয়া উঠিল ; বেদনাও বেশ হইয়াছে—খানিকটা তেল হইলে বেশ হইত।

কিন্তু তেল পাইতে হইলে যে মাকে পিঠটা দেখাইতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল মায়ের লোহার হাতাখানার কথা।

অবশেষে কয়টা আগাছার ডাল ভাঙিয়া শ্রীমন্ত পিঠে বুলাইয়া লইল। এ গুলি নাকি বিশল্যকরণীর ডাল। লক্ষ্মণের শক্তিশেলের আঘাত ইহাতে আরোগ্য হইয়াছিল—এ তো কয়টা চড় চাপড়।

বাড়ীর দুয়ার হইতেই সে শুনিল তাহার ভাগ্নী গৌরী সন্ধ্যাকাশে তারা গুণিতেছে—'এক তারা নাড়াখাড়া, দু তারা কাপাসের খাড়া,—'

শ্রীমন্ত বেদনার কথা ভুলিয়া গেল,—সেও বহির্দ্বার হইতে আরম্ভ করিল—

'তিন তারা পাটে বসি—চার তারা ঘোর মোর।'

নামের মধ্যে মানে খুঁজিলে শ্রীমন্তের কোন অর্থ-ই হয় না .—দুনিয়ার অভিধান হইতে বাদ পড়িতে হয়। ঐ ছেলেটা বলিয়াছে ঠিক শ্রীমন্তের নাম শ্রীমন্ত আর অন্ধের নাম পদ্মলোচন প্রায় সমান শোভন। শ্রীমন্তের কোন শ্রীই ছিল না। দেহের শ্রী—রূপ, অন্তরের শ্রী—গুণ, ঘরের শ্রী—লক্ষ্মী এ তিনের একটীও শ্রীমন্তের ভাগ্যলিপিতে বিধাতা বোধ হয় লেখেন নাই।

কর্কশ পাক-দেওয়া কঠোর গিঁঠ-গিঁঠ দেহ, দীপ্তিহীন চোখ, তামাটে চুল, মুখে অজস্র তিল—সর্ব্বোপরি কর্কশ তাম্রাভ দেহবর্ণ তাহাকে বেশী শ্রীহীন করিয়াছিল। সে যেন কাল হইলে এর চেয়ে অনেক শ্রীমন্ত হইত।

সত্যই হয় তো সে এর চেয়ে অনেকটা শ্রীমন্ত হইলেও হইতে পারিত। মাটীর বুকে শিশু প্রথম যখন আসে তখন সঙ্গে আনে সে আকার,

লাবণ্য আনে না। সে দেহে লাবণ্য রূপ সঞ্চারিত করে ধরণীর প্রসাদ।

শৈশবের শিশু শ্রীমন্তেরও আর পাঁচটা ছেলের মতই ফুলো ফুলো গাল, নরম নরম হাত-পা, মোট কথা—একটী মানব শিশুর যাহা যতটুকু প্রয়োজন সবই ছিল। ছিল না দারিদ্র্যশীর্ণা জননীর বুকে দুধ.—ছিল না বাপের গোয়ালে গাই বা বাপের বাক্সে দুধ কিনিবার কড়ি।

শুকাইয়া শুকাইয়া শৈশব কাটিল, আসিল কৈশোর। কিন্তু সে যেন এক অনাবৃষ্টির বর্ষা,—দেহে পুষ্টি, অবয়বে লাবণ্য, ফসলের ফুলের মত অভাবের শোষণে কুঁড়িতে উঁকি মারিয়া শুকাইয়া গেল। 'সুখের ঘরে রূপের বাসা' কথাটা সংসারে অতি সকরুণ সত্য। তাই বাপ মায়ের শ্রীমন্ত দুনিয়ার কাছে ছিমন্ত হইয়া গেল। পাড়াপ্রতিবেশীর দল অপরিমেয় সহানুভূতিতে শ্রীমন্তের বাপ মায়ের চরম অবিবেচনার অপরাধ সংশোধন করিয়া লইল। আবার ছিমন্তের—ছি-তে একটা লম্বাটান মারিয়া সুর দিয়া সুসঙ্গত করিয়া তুলিল।

শ্রীমন্তের তাহাতে রাগ রোষ নাই। সে বেশ হাসি মুখে ঐ-নামেই সাড়া দেয়। মা রাগ করে, বলে,—খেতে পরতে দেয় কেউ? আর নিজেরা ত সব মদনমোহন!

শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যায়; মায়ের রোষের হেতু সে খুঁজিয়া পায় না।

সে বলে—বল্লেই বা!

—বল্লেই বা?—তোর দেহে কি পিত্তি নাইরে?

বাপ ঘরের ভিতর হইতে কহে—পিত্তি বেশ আছে, কাজের জন্তে দু'টো কড়া কথা ব'লে দেখনা ছেলের লাল চোখ। মনে হয় দিলে বা খুন ক'রে। আবার বেহারী বাগ্দী ওস্তাদের কাছে লাঠী খেলা শেখা হচ্ছে। ঘটে নাই বুদ্ধি,—ছিমন্ত বল্লে কি বলা হয় তা কি মাথায় ঢোকে?

শ্রীমন্ত আড়ালে গিয়া দেওয়ালকে দাঁত দেখাইয়া বাপকে ভেঙচী কাটে, কহে—নাঃ মাথায় ঢোকে না ; ওর মত সবাই কি না ? ছিমন্ত বল্লে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ে না কি ?

যাক্ ওসব গত ইতিহাস।

পেয়ারা চুরীর পরের দিনের কথা। সেদিন শ্রীমন্ত পাঠশালায় যায় নাই। বইদপ্তর বগলে মুখুজ্জেবাড়ীর খিড়কী পুকুরের চারিপাশে সে ঘুরিতেছিল। পুকুরের মধ্যস্থলে একপাল হাঁস কলরব করিয়া ফিরিতেছে।

মুখুজ্জেবুড়ীর ঘটী মাজা আর শেষ হয় না! শ্রীমন্ত বুড়ীকে মনে মনে অভিসম্পাত দিল।

একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে আঁচল হইতে একমুঠা ধান জলের ধারে ধারে ছিটাইয়া দিতে সুরু করিল। তবু হাঁসগুলা এদিকে আসে না। শ্রীমন্ত একটা ঢেলা লইয়া হাঁসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। কোনটার গায়ে ঢেলা লাগিল না বটে কিন্তু হাঁসের দল কলরব করিয়া উঠিল। মুখুজ্জেবুড়ীর নজর গিয়াছে কিন্তু কাণ বড় সজাগ। বুড়ী কাঁপা-গলায় চিলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল—

কে—রে মুখপোড়া দস্যি, বলি কার পেটে আগুন লাগল ?—কে ঢেলা মারছিস ? এ্যাঁ—ওই যে দাঁড়া দাঁড়া চিনেছি আমি তোকে। যাই আমি পাঠশালার পণ্ডিতের কাছে।

শ্রীমন্ত কিন্তু ভয় খাইল না। সে বুড়ীর এ পুরাণো ধাপ্পাবাজী বেশ জানিত ;—শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়াছিল দক্ষিণ পাড়ে আর বুড়ী লোক চিনিতে-ছিল পূর্ব্ব পাহাড়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া। সে বুড়ীকে মুখ ভেঙাইয়া আপন মনেই হাসিতেছিল।

কে-রে, কে-রে—

মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। শ্রীমন্ত ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল খোট্টা ফলওয়ালাটা তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়াছে। খোট্টাটার পিছনে রামকেষ্ট দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

রামকেষ্ট কহিল—চল্ পণ্ডিত তোকে ডাকছে!

জোঁয়ালঘাড়ে নূতন গরুর মত ঘাড় ঝাঁকি দিয়া শ্রীমন্ত আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যা—ও আমি যাব না। যা—ও।

খোট্টাটা এবার তাহাকে শিশুর মত কোলে তুলিয়া লইয়া পাঠশালা-মুখে চলিল। খোট্টাটার কোলে যাইতে যাইতে শ্রীমন্ত পণ্ডিতের কঞ্চিটার কথা ভাবিতেছিল। সরু লিক্‌লিকে পাকা বাঁশের কঞ্চি যেখানে পড়িবে সেইখানেই কাটিয়া বসিবে। পাঠশালাও আসিয়া পড়িয়াছে।

গণেশ পালের দাওয়ার পর মথুর ঘোসের থামারবাড়ী, তার পর গড়াঞীদের ঘানিঘর,—তার পরই পাঠশালা।

গণেশ পালের দাওয়া পার হইল, মথুর ঘোষের থামারবাড়ীর অর্দ্ধেকটা চলিয়া গেল। শ্রীমন্ত আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। কিন্তু এ বন্দী অবস্থায় কোন উপায়ই আর নাই।

গড়াঞীদের ঘানিঘরও পার হইল। পাঠশালার দরজার মুখে ছেলের দল ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সহসা খোট্টাটা তীব্র বেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া শ্রীমন্তকে ছাড়িয়া দিল; শ্রীমন্ত মাটীতে পড়িয়া গেল না, সে খোট্টাটার বিপুল গোঁফ জোড়াটার একপ্রান্ত ধরিয়া ঝুলিতেছিল।

মাটীতে পদস্পর্শ হইবামাত্র শ্রীমন্ত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া লম্বাটানা এক দৌড় দিল। অনেকটা গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—ছেলের দল কলরোল করিয়া হাসিতেছে, খোট্টা গোঁফের গোড়ায় হাত বুলাইতে বুলাইতে করুণ বিলাপের সুরে পণ্ডিতকে কি নিবেদন করিতেছে।

আপনার হাতের দিকে তাকাইয়া শ্রীমন্ত দেখিল এখনও কয় গাছা বড় বড় গোঁফ আঙুলে তাহার জড়াইয়া আছে। সে নিজেও খুব খানিকটা হাসিল।

আমার পাঠশালায় খবরদার আর আসবেনা তুমি।

মুখ তুলিয়া শ্রীমন্ত দেখিল পণ্ডিত পাঠশালার দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহা-কেই সম্বোধন করিতেছে আজ থেকে তোমার নাম কেটে দিলাম আমি।

শ্রীমন্ত জিভ বাহির করিয়া পণ্ডিতকে দেখাইয়া দিল।

তার পর বগলের বইশ্লেট বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া বেশ উঁচু মাথা করিয়াই বাড়ী ফিরিল। বাহির দুয়ার হইতেই সে হাঁকিল—গৌরী—এই নে।

এই মাতৃহীনা ক্ষয়া-ক্ষয়া ফুট্‌ফুটে মেয়েটী শ্রীমন্তের বড় প্রিয়। বছর চারেকের মেয়েটী অপটু পদে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীমন্তকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—কি মামা? পেয়ারা? দা—ও।

শ্লেট আর ছেঁড়া বইখানি আগাইয়া দিয়া শ্রীমন্ত কহিল——না বই

এই বস্তু কয়টীর উপর গৌরীর লোভের পরিসীমা ছিল না। নতুন বোধোদয়খানার মলাট গৌরী প্রথম দিনই ছিঁড়িয়াছিল; শ্লেটখানায় পাথর দিয়া দাগ কাটিয়া একটা স্থায়ী হিজিবিজি সেই রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

পরম আগ্রহে হাত বাড়াইয়া গৌরী কহিল—দাও মামা দা—ও।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে শ্রীমন্তের মা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—

—ছিঁড়ে দেবে, ছিঁড়ে দেবে।

পরম ঔদাস্যভরে শ্রীমন্ত কহিল—যা করবে করুক,—আমার আর চাইনা ওসব।

—কেন ?

—পণ্ডিত আজ তাড়িয়ে দিয়েছে আর আমাকে নেবেনা পাঠশালায়। খাতা থেকে নামও কেটে দিয়েছে।

—কেন ?

—মাইনে দেবেনা—কিচ্ছুনা। তাছাড়া কিস্স্যু হবেনা আমার পণ্ডিত রোজ বলে—

কথাগুলির মধ্যে এতটুকু দুঃখবোধের পরিচয় ছিল না। মা তাহার অবাক হইয়া গেল। কিন্তু বলিবারও কিছু নাই। বেতন না দিলে গুরু যদি বেত না মারেন তবে শ্রীমন্তের অপরাধ কি ?—

যাক্ তবু অপচয় নারীর সহ্য হয় না,—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিল—তবু তুলে রেখে দে। ও মেয়েমানুষ বই নিয়ে কি করবে ?—যত্ন করে তুলে রেখে দে তোর ছেলে হয়ে পড়বে।

শ্রীমন্ত বেশ একটু সলজ্জ পুলক অনুভব করিল, কিন্তু প্রথানুযায়ী আপত্তি জানাইতেই হয়, সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—ধ্যেৎ।

কার্য্যান্তরে যাইতে যাইতে মা বিরক্তিভরে কহিল—তবে যা মন তাই কর। ওইত মেয়েকে মানুষ করছি ; ঘরের দোরে বাপ থাকতে একটা খোঁজখবর নাই। তার ওপর দে মেয়েকে আকাশের চাঁদ ধরে দে।

মা অন্তরালে যাইতেই কিন্তু শ্রীমন্ত গৌরীর হাত হইতে বই শ্লেট লইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল।

গৌরী কাঁদিতে আরম্ভ করিল—বই নেব—শ্লেট—

মা ঘরের ভিতর হইতে শ্রীমন্তকে তিরস্কার করিল—ওরে ও মুখপোড়া আকাট মুখ্যু, আবার ওকে কাঁদাতে সুরু করলি ? দেখবি দেব গিয়ে হাতার বাড়ি !

শ্রীমন্ত তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল—

পেয়ারা খাবি গৌরী পেয়ারা?—ইয়া বড় তুলতুলে পাকা! গৌরীর সেই এক বায়না—বই—ছেলেট!

বাড়ীর বাহিরে গিয়া শ্রীমন্ত চুমু খাইয়া কহিল—ছি মা, বই ছেলেট নিতে নাই; তোমার ভাইটী হয়ে পড়বে। তোমাকে দিদি বলবে।

ভাই-এর নামে গৌরী প্রবোধ মানিল,—সে উৎফুল্ল হইয়া কহিল—

ভাইটী মামা, আঙা টুক্‌টুকে!

—চুপ্—চুপ্ চেঁচায়না। ছি!

মামার কর্কশ তাম্রাভ মুখখানা ঈষৎ কোমল রক্তাভ হইয়া উঠিল।

পুত্রের এই মা-সরস্বতী বিসর্জ্জনের সংবাদ শুনিয়া শ্রীমন্তের বাপ অকারণে অতি মাত্রায় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ফেলিল; কহিল—

—বেশ ক'রেছিস্, আচ্ছা ক'রেছিস,—ওবেটা জানে কি যে ওর কাছে শিখবি? আবার বেটার মাইনের তাগিদ কত!

শ্রীমন্তের মা কহিল—তা হলে না হয় আমোদপুরের মাইনর ইস্কুলে—

শ্রীমন্তের বাপ দাঁত খিঁচাইয়া কহিল—

মাইনে দেবে কে শুনি? আমোদপুরের মাইনর ইস্কুলে।

ইদিকে লম্বাচওড়া বাত খুব আছে। হুঁঃ।

শ্রীমন্তের মা আর কথা কহিল না। মনে মনে আপন অন্যায়টুকু সে স্বীকার করিয়া লইল। মাত্র ওই কটী কথা বলিয়া শ্রীমন্তের বাপের যেন তৃপ্তি হয় নাই, সে তামাক খাইতে খাইতে আপন মনেই কহিল—

আর চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে হবেইবা কি শুনি? সেইত বাবা শেষকালে হালগরু হোৎ—ত্যা—ত্যা।

শ্রীমন্তের মা তবু কোন উত্তর করিল না। বাপ পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—

সেই ভাল, তুই কাল থেকে আপনার কুলকর্ম্ম শেখ। কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে কি হয় শুনি? তার চেয়ে মাটীর বুকে ফালের আঁচড় দে—ফুল ফুটবে, ফসল হবে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঘরে এসে ঢুকবে।

শ্রীমন্তের বাপ চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত কহিল—সেই ভাল মা, এবার বাপবেটাতে আলুর চাষ করব। দোগাছির সবজান সেখ আলুর চাষে এমন ফেঁপে উঠেছে মা,—কি আর বলব তোমাকে। ওর নাতি ইস্কুলে আসে সাটিনের জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় জরীর তাজ।

মা হাসিয়া কহিল—তাই কর।

শ্রীমন্ত রুক্ষভাবে কহিল—তোমার ত কিছুই মনে ধরে না দেখি। চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি হবে শুনি?

—কিছু হয় না শ্রীমন্ত। কিন্তু তোদের সংসারে আমার কি একদণ্ড দুঃখ করবারও অধিকার নেই রে? সুখ দুঃখ নিয়েই ত মানুষের দেহ।

মায়ের উত্তর শ্রীমন্তের মনঃপুত হইল না; কিন্তু এ কথার উত্তরে সে কিছু বলিতেও পারিল না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হালের গরু জোড়াটার পাশে দাঁড়াইয়া সে তাহাদের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। গরু দুইটার পায়ের কাছে গোবরে চোনায় কাদা হইয়া উঠিয়াছে, ডাবায় এককুটী খড়ও নাই।

শ্রীমন্ত আপন মনেই কহিল—হুঁঃ। গরু দু'টো অনসেবায় হয়েছে দেখ দেখি?—এই গরুর সেবায় অবহেলা ক'রে ক'রেই এই লক্ষ্মীছাড়ার দশা।

কোমরে কাপড় সাঁটিয়া সে গোবর সাফ করিতে লাগিয়া গেল।

—আরে বাপরে বাপ্, তিনদিনকা যোগী, ইস্‌কে অন্দর পাঁও বরাবর জটা নিকাল্ গিয়া !”

কণ্ঠস্বর শ্রীমন্তের ভগ্নীপতি হরিলাল—গৌরীর বাপের।

হরিলালের কথাই এমনি। হিন্দী বাত বলিতে সে কেমন ভালবাসে। সে গেরুয়া কাপড় পরে,—গোঁফ দাড়ী রাখে, তেল মাখে না। বাম বাহুতে একটা লোহার তাগা পরিধান করিয়া রাখে। গাঁজা খায়, একটা তানপুরা লইয়া গলা সাধে।

শ্রীমন্ত হরিলালের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া শ্রীমন্তের পিঠে চাপড় দিয়া কহিল—কেয়া বাবুজী—সমঝা নেহি? বলি পাঠশালা ছাড়তে না ছাড়তেই ঘোর সংসারী? একদম গোবরে হাত? তিনদিনের যোগী হ'তে না হতেই পা পর্য্যন্ত জটা গজিয়ে গেল বন্ধু? বহুৎ আচ্ছা, জীতা রহো!

শ্রীমন্ত একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল; সে মৃদুস্বরে কহিল—গরু দু'টোর চেহারা হয়েছে দেখ না? এতে কি চাষ চলে?

তাহার মাথায় এক চাঁটী বসাইয়া দিয়া হরিলাল তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া কহিল—ভাগ্। আয় আমার সঙ্গে আয়। চাষ ক'রে কে কবে বড়লোক হয়েছে? আমি তিনদিনে তোকে মানুষ ক'রে দোব।

শ্রীমন্ত চলিল।

হরিলালের চেলা হইতে শ্রীমন্তের অনেক দিন হইতেই সাধ। হরিলালের ভাঙা বাড়ীতে হরিলালের আড্ডা। দক্ষিণ দুয়ারী কোঠাঘরখানা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পূবদুয়ারী গোয়ালঘরখানা কোনরূপে বজায় রাখিয়া হরিলাল সেইখানে বাস করে। চালে খড় নাই, বাহির দরজায় দুয়ার নাই, কিন্তু উঠানভরা ফুলের বাগান। ঘরের মধ্যে একটা

তানপুরা, একজোড়া বাঁয়া তবলা,—একটা পাখোয়াজ, দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলানো একজোড়া মন্দিরা।

শ্রীমন্তের সেইদিনই দীক্ষা হইয়া গেল। গাঁজা খাইয়া সে অনুভব করিল সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার একটা বোধ জন্মাইয়া গেছে। হরিলালের আসোয়ারী আলাপটা তাহার বড়ই মধুর বোধ হইল। সে আপন মনেই সুরটা ভাঁজিতে ভাঁজিতে বাড়ী ফিরিল—

—তানে নানে নানে না না না—তানে নানে—নানে—মা সেদিন তাহার আহারের পরিমাণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতে শ্রীমন্ত চাষও করে, হরিলালের হাতে মানুষও হয়, আবার বেহারী ওস্তাদের আখড়ায় লাঠীও খেলে। লোকে দু'নৌকা ধরে, শ্রীমন্ত তিন নৌকা ধরিল।

শ্রীমন্তের আহার অকস্মাৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় মা ভাবিল চাষের পরিশ্রম আর ছেলের বাড়ার বয়স তাই বোধহয় আহার এমন বাড়িয়াছে। সময়ে অসময়ে চোখের লালিমা দেখিয়া ভাবিত রৌদ্রে ঘোরাঘুরির জন্য এমন হইয়াছে। কিন্তু সন্দেহ জন্মাইয়া দিল শ্রীমন্তের ঐ আসোয়ারী আলাপ। সহসা ছেলের এরূপ সঙ্গীতানুরাগের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সমস্তই মা জানিয়া ফেলিল। হরিলালের আড্ডা হইতে সেদিন বোধহয় ভৈরবী সাধিতে সাধিতে শ্রীমন্ত বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল—মা!

পিছন হইতে মা বাড়ী ঢুকিয়া কহিল—আমার কপালে কি এমনি ক'রেই আগুন ধরিয়ে দেয় শ্রীমন্ত?

প্রশ্নটার অর্থ শ্রীমন্ত একবিন্দু বুঝিল না, কিন্তু গুরুত্ব বেশ অনুভব করিল। ভৈরবীর আলাপটা স্থগিত রাখিয়া মায়ের মুখপানে সে চাহিয়া রহিল।

মা কহিল—শেষ তুই হরিলালের সঙ্গে—

শ্রীমন্ত বুঝিল সে ধরা পড়িয়া গেছে; তাহার বোধ হইল তাহাকে কে যেন গলায় ধরিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া ধরিতেছে।

মা আবার কহিল—ছি—ছি,—ছি রে আমার কপাল!

শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। হরিলালের সহিত মেলা-মেশায় মা যে এমন ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মূলে একটা কারণ ছিল। জামাইটীকে শ্রীমন্তের মা বেশ সুনজরে দেখিত না। তাহার ধারণা ছিল গৌরীর মায়ের যে হঠাৎ বাকরোধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছিল তাহার হেতু কোন রোগ নয়; তাহার হেতু ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন নেশাখোর জামাতার অত্যাচার,—সে লাথি হোক, কিল হোক, চড় হোক, বা যাই হোক। আপনার মেয়ের মেয়ে, তাই দায়ে পড়িয়া গৌরীকে বুকে করিতে হইয়াছে, নতুবা ও বংশের ছায়াতেও তাহার বিষদৃষ্টি ছিল। আরও তাহাদের পর্য্যায়ের সাধারণের চেয়ে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন একটু উঁচু ছিল। মা সেদিন আর ছেলেকে খাইতে পর্য্যন্ত ডাকিল না।

রাত্রে স্বামীকে সে কহিল—ছেলেকে হরিলালের সঙ্গ ছাড়াও। মাঠে কখন যায় কি করে জানিনা কিন্তু ঘরবাস ত ছেড়েছে।

বাপ একটু অধিক পরিমাণে বাস্তব-রাজ্যের লোক, সে কহিল—তা' হরিলালের সঙ্গে মিশলে দোষ কি? জান ওর অনেক কিছু মাথায় খেলে। রোজগারে ওর মত মাথাই হয় না। শিখতে পারলে আখেরে ভাল হবে।

শ্রীমন্তের মা ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল; তারপর ধীরে ধীরে সে কহিল—তা' হলে ত রাধারাণীর মরণে তোমার কোন কষ্ট হয় নি?

স্বামী চমকিয়া উঠিল, কহিল—কেন ?

—নইলে তুমি ওই জামাইএর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হও, না ছেলেকে-তারই কাছে তার আচার-ব্যাভার শিখতে মত দাও !

শ্রীমন্তের বাপ এমন ভাবে নাই। এ কথার মানে যে এমন হইতে পারে এ তাহার ধারণারও অতীত ছিল। কিন্তু মনে মনে সে ভাবিল্ল শ্রীমন্তের মা ধরিয়াছে অনেকটা ঠিক। কন্যাহন্তা জামাতাকে সে মার্জ্জনা করিয়াছে এটা সত্য। ফন্দীবাজ হরিলাল নানা ফন্দীতে উপায় করে,—অভাবী সে, তাহার জন্য তাহাকে প্রশংসা করে এও ঠিক। মাঝে মাঝে হাত পাতিলে সে কিছু কিছু পাইয়াও থাকে। নীরবে খতাইয়া দেখিল তাহার স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ সত্য। বুকের ভিতরটা তাহার কেমন করিয়া উঠে। অভাবের নির্ম্মম পেষণে তাহার অন্তরাত্মার বিকৃতস্বরূপ দেখিয়া সে আজ শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে উঠিয়া যাইতে যাইতে কহিল—রাধুর মা ! তুমি কথাটা বলেছ ঠিক। কিন্তু কি করব বল অ-ভর পেট সন্তান খেয়েও ভরেনি, তাই ক্ষিদের জ্বালায়—কার কাছে হাত পাততে হয় না হয় তাও ভুলেছি ;—উপায় নাই।

স্ত্রীও এমন উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। সেও এই উত্তরে অভিভূতের মতই স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল, কোন সান্ত্বনা-বাক্যও জোগাইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামী আহারে বসিলে শ্রীমন্তের মা কহিল—ছেলের বিয়ে দাও।

স্বামী তাহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিল।

শ্রীমন্তের মা আবার কহিল—বিয়ে দিলে ছেলের ঘরে মন বসবে, তখন একটু বাগিয়ে ধরলেই ছেলে বশ মানবে।

শ্রীমন্তের বাপের মন এই শোকস্মৃতিটা ভুলিবার জন্য এমনি একটা

বিষয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছিল। সে সোৎসাহে কহিল—বেশ বলেছ তুমি; -হাতীর গলায় ঘণ্টা না হলে হাতী ভাল চলে না; তালে তালে পা ফেলতে তার মন ওঠে না।

ঘরের মধ্যে লুকাইয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে শ্রীমন্ত কথা কয়টা শুনিল। একটা অপূর্ব্ব পুলকে তাহার চিত্ত কেমন সরস হইয়া উঠিল। উৎসাহে সেদিন সে গোটা মাথাটা ব্যাপিয়াই সিঁথী চিরিয়া টেরী কাটিয়া ফেলিল। তারপর গাড়ী জুড়িয়া ধান আনিতে চলিল। মনোরথ তাহার উড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বুড়া বলদ দুইটার গতি বড় মন্থর! সে তাহার সহ্য হয় না। বুড়া বলদ দুইটার পিঠে আঙুল টিপিয়া, পেটে পায়ের গুঁতা দিয়া শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমন্ত গরু দুইটাকে ছুটাইল। গাড়ী ছুটিয়া চলে, শ্রীমন্ত হাতের পাঁচন গাছটা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হাঁকে—হৈও চলে মটরগাড়ী ভরর ভরর ভোঁ ভোঁ!

চার

ঠিক ওই দিন হইতে শ্রীমন্ত যেন আর একটী মানুষ হইয়া উঠিল। ঘণ্টার নামেই হাতী তালে তালে পা ফেলিতে সুরু করিয়াছে। হরিলালের আড্ডায় যাওয়া-আসা যথাসম্ভব কম করিল। অতি সন্তর্পণে আঁকা-বাঁকা জনহীন পথ দিয়া মৌতাতের সময় সে আড্ডায় গিয়া উঠে। রাগিণী আলাপ সে একরকম ছাড়িয়াই দিল। ঘর-দুয়ারের কাজেকর্ম্মে সে এখন অসম্ভব রকমের মনযোগী হইয়া উঠিল। খামারখানি নিকাইয়া তকতকে ঝকঝকে করিয়া তুলিয়াছে; ক্ষেতের মাটী কোদালের কোপে মাখনের মত নরম হইয়া উঠিল। ফসলের পল্লবগুলি সতেজ শ্যামলতায় মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে।

লোকে কহিল—এইবার বলাই পালের ঘরে লক্ষ্মী হবে। ছি-মন্ত লক্ষ্মীমন্ত ছেলে।

শ্রীমন্ত মনে মনে হাসিয়া ভাবিত—তবু ত লক্ষ্মী এখনও ঘরে আসে নাই।

মা ইঙ্গিতে স্বামীকে কথাটা বুঝাইয়া মৃদু হাসি হাসিত। বলাই পালও ঘাড় নাড়িয়া সেটুকু উপভোগ করিত।

সেবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলায় গিয়া শ্রীমন্ত খানকয় পট কিনিয়া আপন ঘরটীর চারিদিকের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল।

গৌরী পাশে দাঁড়াইয়া মামার এই রূপ-রচনা দেখিতেছিল। শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কেমন হ'ল গৌরী ?

গৌরী উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—খু—ব ভাল, ভা—রী সুন্দর।

শ্রীমন্ত চুমা খাইয়া সাদরে কহিল—ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।

গৌরী চুপি চুপি কহিল—মামীমা আসবে নয় মামা ?

গৌরীর বুদ্ধিমত্তায় শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গৌরী আবার কহিল—ভা—রী সুন্দর হয়েছে মামা! আমাকেও পট কিনে দিয়ো, আমারও বিয়ে হবে।

শ্রীমন্ত গৌরীর বিবাহের কথাটা আমলেই আনিল না, চিত্র-শোভিত দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে কহিল—

—দেখ্‌বি দোরের পাশে-পাশে কেমন পদ্ম আঁকব। মুখুজ্জেদের রামের কাছে কম্পাস নিয়ে আসব।

মোট কথা—ভাবী গৃহলক্ষ্মীর আগমন-প্রত্যাশায় শ্রীমন্ত রুক্ষ-দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী-শতদল রচনা সুরু করিয়া দিল।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির মেলা হইতেই সে চার পয়সায় দু'খানা গোলাপী রঙের সাবান কিনিয়াছিল। মুখের দাগগুলা লুপ্ত করিতে স্নানের সময় প্রবলাবেগে সে সাবান মাখা আরম্ভ করিল।

কয়েকদিন পরে গৌরী কহিল—

—মামা কি সুন্দর হয়েছে, দিদ্‌মা,—দেখ—কেমন রাঙা টক্‌টকে।

শ্রীমন্তের মা কহিল—তোর মুখখানা কি হয়েছে রে শ্রীমন্ত?—বাঁদরের মুখের মত লাল। মুখে একটুখানি তেল বুলিয়ে নিস রাত্রে।

শ্রীমন্ত আরসী লইয়া দেখিল—সত্যই ঝামা ইঁট দিয়া মুখখানা কে যেন ঘষিয়া দিয়াছে; তাহার উপর শীতের হাওয়ায় ফাট ধরিয়াছে।

যাই হো'ক মুখের কাটে তাহার বিবাহ আটক রহিল না। ঐ রূপেই সে বর সাজিয়া বৌ লইয়া হাসিমুখে ঘরে ফিরিল।

বৌটী নেহাৎ ছোট নয়, বারো তেরো বছরের মেয়ে;—নাম গিরিবালা।

দেখিতে শুনিতে নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু কুৎসিত নয়। শ্যামলা রং, মাঝারি চোখ, নাকটী একটু চাপা—কিন্তু তাহাতেই যেন মেয়েটীর মুখখানি ভাল মানাইয়াছে। দেহের গঠন-ভঙ্গীটি কিন্তু অনবদ্য, দীঘল দেহখানি সুসন্নিবিষ্ট—দৃঢ়—সুপুষ্ট। গরীবের মেয়ে আবাল্য পরিশ্রমে সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত দৃঢ় করিয়া নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে। আরও—সে গঠন-ভঙ্গীর মধ্যে মধুর একটী লাবণ্যময় পারিপাট্য আছে।

ব্যবহারেও গিরি মেয়েটী বেশ সপ্রতিভ; কয়দিনের মধ্যেই নতুন সংসারে আপনাকে বেশ মিশাইয়া লইল। স্বচ্ছন্দ ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, শাশুড়ীর হাতের কাজ কাড়িয়া করে; গৌরীর মুখ মুছাইয়া দেয়; যেন কতদিনের পুরানো এই সংসারেরই একজন সে।

শ্রীমন্তের মা বউটীকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিল। সে ভালবাসা আরও বাড়িয়া গেল—সেদিন রাত্রে পুত্র-পুত্রবধূর গোপন আলাপ শুনিয়া।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্তের ফিরিতে একটু দেরী হইয়াছিল। গিরি বোধ করি তাই লইয়া অভিমান করিয়াছিল।

শ্রীমন্তের অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে কহিল—যাও তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না বলছি।

শ্রীমন্ত কহিল—আর দেরী হবে না গো!

—না;—তুমি ওই ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গ যদি না ছাড়—

—তার ওপর রাগ কেন? সে কি করলে?

—সে কি করলে?—আমি কিছু জানি না বুঝি? ওই ত ঠাকুর-ঝিকে খুন ক'রে ফেলেছে। লজ্জা করে না তোমার?

শ্রীমন্তের আর কথা জোগাইল না। গিরি আবার কহিল—

—ওই আড্ডায় যাও—গিয়ে পরিবার খুন করা শিখে এস। আমাকেও তুমি কোনদিন খুন ক'রে ফেলবে।

শ্রীমন্ত নীরব। গিরি আবার কহিল—বল আর ওখানে যাবে না?

শ্রীমন্ত তবুও নীরব। গিরি এবার কাঁদিয়া কহিল—আমার মা নাই, বাপ নাই, খুড়ো-খুড়ীর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে এতকাল কাটল। ভেবে-ছিলাম এইবার সুখের মুখ দেখব, তা—পোড়াকপালে হবে কেন?

শ্রীমন্ত এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আচ্ছা আর যাব না।

গিরি বলিল—আমার গায়ে হাত দিয়ে সত্যি কর। কর—। চুপ ক'রে রইলে যে? দেখ—তুমি গাঁজা খাও ত? সে আমি জানি। আমি গাঁজার জন্যে রোজ একটা ক'রে পয়সা দেব। সত্যি ক'রে বল আর যাবে না তুমি?

শ্রীমন্ত এবার উৎফুল্ল ভাবেই শপথ করিয়া ফেলিল।

শ্রীমন্তের মায়ের বধূপ্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বহু আশীর্ব্বাদ তিনি বধূর শিরে বর্ষণ করিলেন।

শ্রীমন্ত ইহার পর হইতে আরও তালে তালে চলিতে আরম্ভ করিল

তবু মায়ের সম্পূর্ণ আক্ষেপ মিটিল না, বাপেরও না। মায়ের আক্ষেপ—শ্রীমন্ত হরিলালের সঙ্গ ছাড়িল কিন্তু গাঁজা ছাড়িল না। কিন্তু মা ভরসা এখনও একেবারে পরিত্যাগ করে নাই—কারণ সে বেশ বুঝিয়াছে যে দেহের ওজনে বধূ মেয়েটী লঘুভার হইলে কি হয়—মনের ওজনে গিরি গিরির মতই গুরুভার, সে যখন ঘাড়ে চাপিয়াছে তখন শ্রীমন্ত কায়দায় আসিবে।

বাপের আক্ষেপ—ছেলেটা হরিলালের রোজগারী ফন্দীর যোল আনার এক আনা দূরে থাক এক অনুও আয়ত্ত করিতে পারিল না।

এদিকে হরিলালের আড্ডায় শ্রীমন্তের এই নিয়মিত গরহাজিরায় একটু চাঞ্চল্য উঠিল। এ দল ত ছাড়িয়া যাওয়া সোজা নয়, একটা কোকিল এই আড্ডায় পোষা হইয়াছিল, সেটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মুক্ত পাখীটাকে আজও দুধ আফিং-এর টানে নিত্য বৈকালে হাজিরা দিতে হয়। আর একটা ছোঁড়া কিনা শিকল কাটিল!

হরিলাল গাঁজা টিপিতে টিপিতে ঘাড় নাড়িয়া গান ধরিল—

রমণী-রতন, মনের মতন, ও-হায় ভুলিয়েছে মন।

—শালাকো নয়া নিশা মিলা হ্যায়, আচ্ছা রহে দেও, তিন থাপ্পড়মে শালাকো নিশা টুটায়েগা হাম।

শ্রীমন্তের সঙ্গী বিপিন, সেও এ পাঠশালায় নোতুন পড়ুয়া; সে কহিল—গাঁজা না খেয়ে বৌয়ের সঙ্গে আলাপ জমায় কি ক'রে?

হরিলাল ওধার দিয়া যায় না, সে কহিল—জমুক আর ফেঁসে যাক্, হাম লোককা কেয়া? যিস্‌কা ফাটে উস্‌কা ফাটে, ধোবিকা কেয়া? অগর্ হামলোককা একরোজ খিলানা চাহি।

হরিলাল সেদিন শ্রীমন্তকে ধরিল। শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিতেছিল—

পথে হরিলালের সহিত দেখা। হরিলাল কহিল—এ-ও পাঠশালমে কেঁও নেই যাতা ?

শ্রীমন্ত চলিতে চলিতেই বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আর যাব না।

—কেঁও ? হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—কেঁও আবার কি ? তোমার সঙ্গে মানুষে মেশে ?—মিশে ত শেষে বউ খুন করতে শিখব।

আর যায় কোথা ! হরিলাল খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে, সে খপ্ করিয়া শ্রীমন্তের চুলের মুঠা ধরিয়া টান মারিয়া কহে—

—কোন্ শালা এ কথা বোল্‌তা হ্যায়—কোন্ হারামজাদ,—খুন করেঙ্গে, কাট-ডালেঙ্গে—।

হরিলালের ওই একটা বিশেষত্ব, রাগিলেই সে তলোয়ার ভাঁজিত, শত্রুর শির সে আর রাখিত না—অন্ততঃ মুখে।

লাঠী-খেলা-কঠোর কর্কশ হাতে হরিলালের প্যাকাটীর মত হাতখানা মুচ্‌ড়াইয়া শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল—এই দেখ, আমার সঙ্গে বেশী চালাকী করো না বলচি, তোমাকে দুমড়ে ভেঙে দেব—।

শ্রীমন্তের কথাটা বলা বাহুল্য হইল; হরিলাল সেটা পূর্ব্বেই বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু লম্ফঝম্প ত্যাগ করে নাই।

—দেখ লেঙ্গে—হাম, দেখ লেঙ্গে, হামরা সাথমে রহেনেসে তেরা আখের মে ভাল হোতা, আচ্ছা যাও—যাও,—তুমকো কুছ বোলা ঝুট, মানুষ হলে বুঝতিস্, বুঝলি—মানুষ হ'লে বোঝে কচু হ'লে সেক্কে—তোম দকর কচু হ্যায়,—দকর কচু—!

হরিলাল তখন এই বলিয়া সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু একেবারে ব্যাপারটা ছাড়িল না। আবার গিয়া আসর পাতিল শ্রীমন্তর বাড়ীতে।

—হাজার হোক শ্বশুর বাড়ী, শাশুড়ী সুনজরে দেখুক না দেখুক,—অন্ততঃ খেদাইয়া দিতে পারিবে না। আরও ভরসা—শ্বশুর অবাধ্য নয়। সে এবার এক ছুরি হাতে করিয়াই হাজির,—মুখে একটু মদের গন্ধ,—

—এ প্রাণ আর রাখবই না,—ছি-মন্তে আমার অপমান করে—!

শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে,—শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করে, —দাও পায়ের ধুলো দাও,—এ প্রাণ আর রাখবই না। একটা ছোট-লোকের মেয়ের পরামর্শে ছি-মন্তে কিনা,—নাঃ—এ প্রাণ আর রাখবই না।

শাশুড়ী বিব্রত হইয়া কহে—দোহাই, বাবা আমার, আসুক শ্রীমন্তে,—

—কভি নেহি—এ জান নেহি রাখে গা—। বলিয়া সে ছুরীটা উঁচু করিয়া তোলে।

শ্বশুর হাতে চাপিয়া ধরে, শাশুড়ী চেঁচাইয়া উঠে—। গিরি পিছন হইতে শাশুড়ীকে কহে—মা শ্বশুরকে হাত ছেড়ে দিতে বল।

—সে কি গো—খুন খারাপী হবে!

বউ বলে—হ্যাঁ খুন কতজনা হয়েছে, ও হবে; বলে একটা কাঁটার ঘা মানুষের সয় না, নিজের বুকে ছুরী বসাবে নিজে। কথাটা শ্বশুরের কাণেও গিয়াছিল, বাস্তব রাজ্যের লোক সে, কথাটা এক দণ্ডেই কাণের ভিতর দিয়া মরমেও গিয়া পশিল। সে সত্যই হরিলালের উদ্যত হাতখানা ছাড়িয়া দিল।

কেহ ধরে না দেখিয়া হরিলালকেও ছুরী নামাইতে হইল। শুধু ছুরী নামাইতে হইল না, ওই এক রত্তি মেয়েটার কুবুদ্ধির নিকট মাথা নামাইয়াও সরিয়া পড়িতে হইল। উড়া পাখী আর ধরা পড়িল না।

পাঁচ

দিন দাঁড়াইয়া থাকে না, দিনের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার বয়স বাড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত পুরা জোয়ান হইয়া উঠিল, গিরিও ঘরণী হইয়া উঠিল, শ্রীমন্তের মা বাপ বৃদ্ধ হইয়া একে একে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্তের তাহাতে বড় আক্ষেপ নাই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে মা বাপের শোক ভুলিয়াছে। কিন্তু গিরির আক্ষেপের সীমা নাই,—সে শাশুড়ীর আক্ষেপ মিটাইতে পারে নাই,—নারী হইয়া একটী পৌত্র শাশুড়ীর কোলে সে তুলিয়া দিতে পারে নাই। শুধু ত আক্ষেপ নয়, এ নিষ্ফলতা তাহার নারীত্বের কলঙ্ক। শাশুড়ী রাজ্যের মাদুলী তাহার গলায় দিয়া তাহাকে কত ব্রত বার করাইয়াও যখন কিছুতে কিছু ফল পায় নাই—তখন সেকথা একদিন মুখ ফুটিয়া বলিয়াও ছিল, নাতির জন্মে পাতা কোল আমার খালিই রহিল। আমার যেমন ভাগ্যি,—নইলে এমন অফলা হতভাগা মেয়ে আমার ঘরে আসবে কেন?

বিপিনের মা ছিল কাছে বসিয়া, সে বলিয়াছিল,—এক কাজ কর শ্রীমন্তের মা,—কার্ত্তিক পূজো কর—।

শ্রীমন্তের মা অতি ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল—কি যে বল বিপিনের মা? কথায় আছে জান,—'হবে নারে বাঁজার ছেলে, কার্ত্তিক রে তোর বাবা এলে—।' ও সব মিছে,—ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি—!

ওই কথাগুলি গিরি আজও ভুলিতে পারে নাই। যখনই তাহার সন্তান-ক্ষুধাতুর নারী-মন আপন শূন্য কোলের পানে তাকাইয়া উদাস হইয়া উঠে, তখনই ওই কথাগুলি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও শাশুড়ীর সে আক্ষেপ তীব্রকণ্ঠে তাহাকে ধিক্কার দেয়। নিরুপায়ে গৌরীকেই সে বুকে

জড়াইয়া ধরিল, সান্ত্বনাও পাইল। সংসারে পালনের মমতাটাই বোধ করি সব চেয়ে বড়। ভূমিষ্ঠ হইয়া যে সন্তানটী মাতার যায়—তাহার শোক মায়ের ভুলিতে বড় বেশী দিন লাগে না। কিন্তু লালনে-পালনে বর্দ্ধিত-বয়স্ক সন্তান মায়ের বুকে যে শক্তিশেল হানিয়া যায়,—সে শক্তিশেলের বেদনার কোন বিশল্যকরণীতেই উপশম হয় না। যৌবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর জীবন-পাত্রে যে স্নেহ-রসধারা উচ্ছল হইয়া উঠে, তাহাই মাতৃত্বের উপাদান। নারী সন্তান চায় শুধু ওই স্নেহরস-ধারায় তাহাকে সিঞ্চিত করিতে। ভ্রূণ সৃষ্টি করে অদৃশ্য হস্ত, সে ভ্রূণকে আপন স্তন্যে, স্নেহ-সুন্দর হস্তে, দিন দিন সুন্দরতর, পরিপুষ্ট করিয়া পূর্ণাঙ্গ সক্ষম মানবে—সৃষ্টি করে নারী। সেইখানেই তার প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দ।

গৌরীকে পাইয়া সেই আনন্দে গিরি আপন ব্যর্থতার বেদনা অনেকটা ভুলিয়াছিল। হয়ত সবটাই ভুলিতে পারিত,—কিন্তু মাঝে মাঝে হরিলাল আসিয়া যখন কন্যার উপর দাবী জানাইয়া যায়, তখনই গৌরী যে আপনার নয়—এই বেদনায় আপনার ব্যর্থতার ব্যথা তাহার মনে পড়িয়া যায়।

ইদানীং হরিলালের সেই দাবীটা কিছু প্রবল ও ঘন ঘন হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে, খাঁকৃতীর বাজার, পেটের ভাত জোটে না - গাঁজা জোটে কেমন করিয়া? কাজেই সে মেয়ের দাবীতে শ্রীমন্তের ঘরে ভাতের ব্যবস্থাটা করিয়া লইতে চাহিল। এখানে ওখানে যায়, ভগবান যেখানে মাপেন সেইখানেই খায়, কিন্তু গ্রামে ফিরিলেই শ্রীমন্তের বাড়ীতে ঢুকিয়াই হাঁকে, "গৌরী তোর মামীকে—না—মা কি বলিস, তুই, বল যে আমি খাব।"

একদিন, দুই দিন, চার দিন, শেষ পাঁচ দিনের দিন গিরির আর সহ্য হইল না;—সেদিন সে ঘোমটার ভিতর হইতেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কিন্তু সে গর্জ্জন হয়ত হরিলালের কাণে গেল না,

বা গেলেও সে তা আমলে আনিল না,—স্ত্রীলোকের কথা আবার ধরে!

গিরির আসল বিরক্তি কিন্তু ভাতের জন্য নয়। হরিলাল যে আসিয়া গৌরীর উপর একটা ভাবে ভঙ্গীতে কথার সুরে পিতৃত্বের দাবী জানায় আপত্তি তাহার তাহাতেই। সেটা বোঝা গেল যখন গৌরী শ্রীমন্তের নিকট হইতে ভিতরে ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়া কহিল,—মাগো, সেই মাতাল জামাইটা এসেছে, বিদেয় কর, বিদেয় কর, ভাত দিয়ে বিদেয় কর মা, বিদেয় কর,—ভাত নইলে ও যাবে না—।

তখন গিরির অধরে হাসি দেখা দিল। সে গৌরীকে একটু পরখ করিয়া লইতে কহিল—সে কিলো—ওই কি বলে—! ও যে তোর বাবা হয়—।

গৌরী মুখ বাঁকাইয়া কহিল—হ্যাঁ—হয়। ওকে কক্ষনো আমি বাবা বলবো না।

গিরির আর আক্ষেপ থাকে না, বরং করুণাই হয় একটু হরিলালের উপর। আহা, দুনিয়ায় আপনার বলিতে ত কেহ নাই ঐ লোকটীর! সে দুই থালা ভাত বাড়িয়া শিকল বাজাইয়া শ্রীমন্তকে ইঙ্গিত করিল।

দু'খানি থালায় আহার্য্য সাজান, কুটুম্বের থালাতেই পরিচর্য্যা বেশী।

রাত্রে ঘুমন্ত গৌরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমন্তকে গিরি কহিল,—দেখ, আপন জন তোমার, তোমার একটু খোঁজ খবর করা উচিত।

শ্রীমন্ত কথা না বুঝিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিল।

গিরি কথাটা ভাঙিয়া কহিল—তোমার ভগ্নীপোতের কথা বলছি,—মানুষটা কি হয়ে গেল, শুধু যত্ন আত্তির অভাবে। যদি ঠাকুরঝি বেঁচে থাকত, তবে কি এমনি হত?

শ্রীমন্ত এবারও স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, গিরির সহসা এ পরিবর্ত্তনের কারণ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

স্বামীর নীরবতায় ঠিক ওই কথাটাই গিরিরও স্মরণ হইল, সে বুঝিল হরিলালের জন্য এতটা ওকালতী তাহার পক্ষে নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। তাই কথাটা সে ঘুরাইয়া কহিল—আপনার জন বলেই বলছি, হাজার হ'লেও গৌরীর বাপ, গৌরীই ত ধর আমাদের সব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—কাজেই, যার নিজের নাই, তার—

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, ক্ষীণ-রশ্মি প্রদীপটির ম্লান আলোকেই গিরির মুখ দেখিয়া সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কিন্তু যে কথাটা মনের মধ্যে ফেরে সেটা চাপিয়া রাখিতে পারে মানুষ কতক্ষণ? অল্প একটু ক্ষণ উভয়েই নীরব, আবার শ্রীমন্ত কহিল—জান, একটা কথা আজও আমি ভুলতে পারি নি। যেদিন আমি পাঠশাল ছাড়ি, সেইদিন পাঠশাল থেকে এসে বই-দপ্তর দিয়েছিলাম গৌরীকে। গৌরীর ভারী লোভ ছিল বই শেলেটের ওপর। তা মা বল্লে, 'রেখে দে, মেয়েতে বই-দপ্তর নিয়ে কি করবে, তোর ছেলে হ'য়ে পড়বে।' সে বই শেলেট আজও তোলা আছে, ওই বেতের ঝাঁপিতে।

গিরি আর শুনিতেও পারিল না। সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে চোখ মুদিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

গিরির এ ব্যথার নীরবতায় শ্রীমন্ত মনে করে গিরি ঘুমাইল বুঝি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেও পাশ ফিরিয়া শোয়। পরদিন শ্রীমন্ত মাঠ হইতে ফিরিয়া বাহির হইতেই শোনে গৌরীর উচ্চ কণ্ঠে বাড়ীখানা মুখর হইয়া উঠিয়াছে, অবোধ্য একঘেয়ে অবিশ্রান্ত ভাবে গৌরী কি বলিয়া চলিয়াছে। সে বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতেই কহিল—কি গো, গৌরী মা—

গৌরী ব্যতিব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া কহিল—চুপ কর, পড়ছি আমি, এই দেখ বই, এই দেখ শেলেট।

সেই বই, সেই শেলেট, ছেঁড়া মলাটে তাহারই বাঁকা হাতে নাম লেখা, সেই শেলেটের কোণগুলি সে-আমলের সেই বুড়া রাম কামারের হাতের তার দিয়া বাঁধা। দু'টি পয়সা সে লইয়াছিল।

শ্রীমন্ত নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া ওই বই-শেলেটগুলির পানে চাহিয়া থাকিল।

কাহার স্পর্শে ফিরিয়া দেখিল গিরি পিছনে দাঁড়াইয়া। কিন্তু এ গিরি ত সে গিরি নয়;—এর দৃষ্টিতে ভিক্ষার ভাষা, [illegible] ভিক্ষার ভাব। শ্রীমন্তেও ব্যথা পাইল, স্নেহাস্পদের কাতরতা তাহার সহ্য হইল না। সে আদর করিয়া কহিল—কি?

গিরি কহিল—কিছু বলো না!

—বলবার মতো ত কিছু করনি তুমি গিরি।

—বই শেলেট আমি দিয়েছি।

—বেশ করেছ, তাতে কি হয়েছে?

—দেখ ছেলেকে কিছুতে বঞ্চিত করতে নাই, তুমি দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলে, তাতে ত ওর মনে দুঃখ হয়েছিল, দীর্ঘ-নিশ্বেস পড়েছিল, হয় ত তাতেই—।

গিরির কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে, চোখ সজল হইয়া আসে। শ্রীমন্ত অতি আদরে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, ছিঃ—কেঁদনা, তোমার কোন্ কাজে আমি না করি বল?

গিরি একটু নীরব থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, —তুমি যা ক'রে চেয়ে দেখছিলে বই-শেলেটের পানে।

শ্রীমন্ত হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—দেখলাম কি জান, বই-এর মলাটে নিজের হাতের লেখা, সেই পাঠশাল মনে পড়ছিল—

এবার গিরি কৌতুক করিয়া কহিল, আর গুরুমশায়ের মার—

শ্রীমন্ত আবার হাসিয়া উঠে।

গৌরী ওদিকে নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল—ক, খ, ল, ষ, মা—বা-বা—গরু, গ, চ, ট, প।

ছয়

ইহার পর কিছুদিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। গৌরী বই-শ্লেট লইয়া অনর্গল পড়ে, কোন দিন বা প্রতিবেশীদের ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালে গিয়াই হাজির হয়।

গিরি রাঁধিতে রাঁধিতে দশবার এদিক ওদিক তাহাকে খুঁজিয়া ফেরে।

শ্রীমন্ত আসিতেই গিরি কহে,—দেখত, গৌরী বোধ হয় পাঠশালা গিয়ে ব'সে আছে,—কি বাই হ'ল মেয়ের মা, আসুক ত আজ, তার বই শ্লেট শেষ ক'রব আমি।

শ্রীমন্ত হাসিতে হাসিতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসে। গৌরী আসে—একেবারে অভিধানের মত অনর্গল বানান আওড়াইতে আওড়াইতে—"ব এ আকার ল এ আকার—বাবা, ম য়ে আকার ল এ আকার মামা" শ্রীমন্ত হাসে, গিরিও হাসে—সে স্পষ্ট না বুঝিলেও বোঝে যে গৌরী নব অভিধানের সৃষ্টি করিতেছে।

মোট কথা ওই শিশুকে কেন্দ্র করিয়া এই দুইটী নরনারী জীবনে যে একটী মধুচক্র রচনা করিয়া তুলিতেছিল সেটী দিনে দিনে বেশ রসঘন হইয়া উঠিল।

কিন্তু দিন সমানে যায় না, সেদিন মাস দেড়েক পরে সহসা ধূমকেতুর মত হরিলাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

পড়ন্ত বেলা, সন্ধ্যা হয়-হয়, গিরি রান্না চাপাইয়া গৌরীকে পড়াইতেছে, গৌরী পড়িতেছে।—যেমন গুরু তেমনি শিষ্য, ভুলচুকের বালাই নাই, শাসন নাই, সংশোধন নাই, আছে শুধু শিষ্যের সপ্রতিভ উত্তর—আর গুরুর সপ্রশংস অজস্র উচ্ছ্বাস, শিষ্যের প্রতিভায় অগাধ বিশ্বাস।

উনানে কাঠটা ঠেলিতে ঠেলিতে গিরি, গুরু গিরি কহিল—আচ্ছা বানান কর দেখি—'কাঠ'।

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর উত্তর—ক এ আকার ল এ আকার।

—বাঃ—বাঃ—আচ্ছা বানান করত—'রান্না'।

—র, ব এ আকার—।

—বাঃ—বাঃ—সোনা-মণিরে আমার।

—এইবার কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ কিনে দিতে হবে আমাকে,—হুঁ—।

—আচ্ছা এই বানান ব'লতে পারলেই দোব—বানান কর—'ডিম্ব'।

—বাঃ—রে, ও যে দ্বিতীয় ভাগের বানান, আমি বুঝি জানি?

এমন সময় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া শীর্ণ কুব্জ লোকটী বাড়ী ঢুকিয়া হাঁকিল—গৌরী—।

অতিরিক্ত গাঁজা খাইয়া হরিলালের পায়ের শিরায় টান ধরিয়াছিল—গোড়ালী আর পড়িত না।

লোকটীর আবির্ভাবে এমন অভিনব বিদ্যার আদান-প্রদানটুকু বন্ধ হইয়া গেল।

হরিলাল বিনা ভূমিকায় কহিল—একবার বাইরে আয় দেখি,—

গৌরীর মুখ শুকাইয়া গেল,—সে গিরির কোল ঘেঁষিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিলালের রুক্ষ মেজাজে এটা সহ্য হইল না, সে কটু কণ্ঠে কহিল—কানকে কেত্‌না ভরি সোনা উঠা হ্যায়?

গৌরী কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, আমি প'ড়ছি যে—।

হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, সে অদ্ভুতরূপ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—পড়ছি ?—পড়ছি কি ?

গৌরীর কথা আর ফুটিলনা, গিরিও ঘোমটার অন্তরাল হইতে জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু জবাব হরিলাল নিজেই খুঁজিয়া লইল, বই-শ্লেটগুলা তাহার নজরে ঠেকিতেই 'পড়া'র অর্থ করিয়া লইল,—সে অতি কর্কশ কণ্ঠে ব্যঙ্গভরে কহিল,—ও—'লি-খা প-ঢ়ি'—। আরে বাপ্‌রে বাপ্। চাষার মেয়ে ধানভানা ছোড়কে—লি-খা—পঢ়ি, তাজ্জব কি বাত্! নাঃ, এরাই দেখছি আমার মেয়ের মাথাটা খেলে।—নে—নে, এখন আয় দেখি এক ঘটী জল নিয়ে, বাইরে লোক এসেছে।"

'আমার মেয়ে'! গিরির অন্তরটা টগবগ্ করিয়া উঠিল। সে চট্ করিয়া উঠিয়া একঘটী জল গৌরীর হাতে ধরাইয়া দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাপের কাছে দাঁড় করাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হরিলাল মেয়ের হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল,—আমার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক আছে, দু'জন খাব,—উম্‌দা রান্না বানাও, মাছ-টাছ না থাকে—কেনো।

ধূমায়মানা গিরি জ্বলিয়া আগ্নেয়-গিরি হইয়া উঠে,—সে হরিলালের পশ্চাতে বেশ উচ্চকণ্ঠেই কহে—বলে নিজের ঠাঁই হয় নাক শঙ্করাকে ডাকে, সেই বিত্তান্ত। পারব না আমি পারব না বলে দিচ্ছি, আপন ব্যবস্থা সময় থেকে করুক যেয়ে···এঃ—আবার মাছ চাই, ভাল রান্না চাই।

আপন মনেই গিরি গর্জ্জন করিয়া চলে, কড়ার উপর হাতার শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে সঘন এবং সুউচ্চ হইয়া উঠে।—

এমন সময় গৌরী ফিরিয়া আসিল, গিয়াছিল সে কাঁদিতে কাঁদিতে কিন্তু আসিল বেশ হাসিমুখে। গিরি ভাবিল বাপের কবল হইতে মুক্তায়

পাইয়া গৌরীর হাসি ফুটিয়াছে। তাহার অন্তরটাও একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বাঁ হাতে উনানের মুখের কাঠখানা ঠেলিয়া দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, কে লো—গৌরী?

ঈষৎ একটু ঝঙ্কার হানিয়া গৌরী কহিল—জানি না।

কিন্তু ঐ ঝঙ্কারটুকুর মধ্যে লজ্জার বেশ একটু আভাষ। গিরির হাতের হাতা স্থির হইয়া গেল, সে মুখ তুলিয়া গৌরীর মুখপানে তাকাইল।

গৌরী আপন ছোট হাতখানির ছোট্ট মুঠাটী চট্ করিয়া খুলিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে কহিল—দেখেছ, দোবনা তোমায়।

চকিতের মত ক্ষণটুকু ক্ষীণ হইলেও গৌরীর হাতের জিনিবটা কি তাহা বোঝা গেল,—টাকা!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! তারও উপর গিরির ঈর্ষা। হরিলাল মেয়েকে আদর করিয়া টাকা দিয়াছে, মুখের কথায় নয়, কাজেকর্ম্মে পিতৃত্বের অধিকার স্থাপন করিয়াছে ইহা গিরির সহ্য হইলনা; সে বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে কহিল।

একশো বছর গিয়েছে চলে,
ভাগ্যি আমার, ভাগ্যি ভাল—
পড়ল মনে এতদিনে দুখিনী বলে।—

—ভাল—তাও ভাল। রেখে দে লো বাপের দেওয়া প্রথম টাকা।—

গৌরীর শিশু মন এই শ্লেষ বুঝিল না, সে এতগুলা কথার মধ্যে বুঝিল শুধু "বাপের দেওয়া টাকা—" ঐ কথাটারই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া সে কহিল—যাঃ জামাই দেবে কেন, ও গাঁজাল টাকা দেবে! আর পাবেই বা কোথা? দিলে সেই লোকটা।

—সেই লোকটা ? কে সে ?

আবার সেই সলজ্জ ঝঙ্কার দিয়া গৌরী কহিল—জানি না—।

হরিলাল টাকা দেয় নাই শুনিয়া গিরি একটু লঘুভার হইয়াছিল। সে এবার একটু হাসিয়া কহিল—সে লোকটার নামে তোর এত লজ্জা কেন? সে তোর শ্বশুর না কি, তোকে দেখ্‌তে এসেছে ?—

গৌরী এবার টুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া চট্ করিয়া কহিল—হুঁ।

হুঁ! সে কি ?

গৌরী কহিল—বলছিল যে জামাই—।

গিরি আর শুনিল না,—সে উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের পিছনে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহার সর্ব্ব অঙ্গ যেন হিম হইয়া গেল। অতি কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে গৌরীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিল। গৌরী অবাক হইয়া গিরির মুখপানে চাহিতেই দেখিল গিরির চোখে জল. সে ছোট হাতখানি দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল,—কাঁদছ মা ?

গিরি কথা কহিল না, তাহার অশ্রুধারার বেগ বাড়িয়া গেল।

গৌরী কহিল,—মা,—ওদের টাকা ফিরে দিয়ে আসব মা ?

গিরি তবুও নীরব, চিন্তাকুল স্তিমিত নেত্রে অন্তহীন ভাবনা সে ভাবিয়া যায়। কতবার তাহার চিন্তা ধারণার সীমা পার হইয়া অর্থহীন হইয়া পড়ে, সচকিত হইয়া আবার সজাগ হইয়া সে ভাবিতে বসে।

গৌরী সেই মুখপানে চাহিয়া বসিয়া ছিল। তাহার পরনির্ভর শিশু-চিত্ত খানি সশঙ্ক আগ্রহে ওই চিন্তাকুলার মুখপানে চাহিয়া থাকে, এটুকু বোঝে যে ভাবনার কেন্দ্র সে-ই, তাহাকে লইয়াই একটা কিছু ঘটিতে বসিয়াছে।

সহসা গিরি যেন সহজ ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, বোধ হয় সে একটা কূল পাইয়াছে,—গৌরীর হাতটা ধরিয়া উজ্জ্বল নেত্রে সে বলিল, খবরদার যাবি না তুই। ও-ই মাতাল, তোর বাপ যদি নিয়ে যেতে চায় তোকে—খবরদার যাবি না তুই।

গৌরীর কেমন শঙ্কা হয়, ওই মানুষটাকে দেখিলেই তাহার যে ভয় হয়! সে তাহার কথার প্রতিবাদ করিবে কেমন করিয়া? সে শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল, যদি ধ'রে নিয়ে যায় মা জোর ক'রে!

—আমার জোর নাই? আমি যে তোকে এত বড় করলাম, আমার জোর নাই?

মামা এলে ওকে তাড়িয়ে দিতে ব'ল মা, দিক লাঠীর বাড়ী।

সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্ত কোদাল হাতে আসিয়া খিড়কীর দরজায় বাড়ী ঢুকিল। বাহির হইতেই সে গৌরীর কথাটা শুনিয়াছিল, হাসিতে তে সে কহিল—কাকে মারতে হবে মামণি?

শ্রীমন্তকে দেখিয়া গৌরীর বুকখানা সাহসে ফুলিয়া উঠিল। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—ওই মুখপোড়া মাতালকে, তোমাদেরই ওই ছাড়া জামাইকে গো।

মেয়ের পিতৃ-ভক্তির ঘটা দেখিয়া শ্রীমন্ত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। গিরির কিন্তু তাহা ভাল লাগিলনা, তাহার চিন্তা-পীড়িত ক্ষুব্ধ অন্তর অতি মাত্রায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সে অস্থির কণ্ঠে আত্মহারার মত বলিয়া উঠিল, আমি মাথামুড় খুড়ে ম'রব ব'লছি।

শ্রীমন্তের প্রাণখোলা হাসি অর্দ্ধ পথেই থামিয়া গেল, সে হতভম্বের মত তাল হারাইয়া গিরির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গিরি উঠিয়া শ্রীমন্তের পায়ে সত্যই মাথা কুটিতে কুটিতে কহিল—বল, বল, তুমি এর বিহিত ক'রবে কিনা বল!

তাড়াতাড়ি শ্রীমন্ত তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতেই সান্ত্বনা দিল—ক'রবো, ক'রবো, ক'রবো, তিন সত্যি ক'রছি, থাম গিরি-বৌ, থাম।

গিরি সজল নেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—তা যদি হয় তা হ'লে ম'রে যাব আমি।

অন্ধকারে দিশাহারার মতই ব্যাকুল ভাবে শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কি, হ'ল কি?

গিরি কি যেন বলিতে গিয়া গৌরীর দিকে চাহিয়া, থামিয়া গেল, কহিল,—ব'লব এর পর।

তারপর গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরে লইয়া যাইতে যাইতে কহিল—মেয়ের চোখে ঘুম নাই মা, রাত দু'পহর পর্য্যন্ত চোখ চেয়ে বসে আছেন। আয়, খেয়ে ঘুমোবি আয়।

শ্রীমন্ত একটা উদ্বেগ লইয়াই তামাক সাজিতে বসিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—আরে ছি-মন্ত নাকি? বহুৎ আচ্ছা রে ময়না, একদম্‌সে পিঁজরাকে ভিতর যাকে বৈঠা! পঢ়ো আত্মারাম 'রাধা-কিষণ সীতা রাম।' তারপর উচ্চ হাসি।

শ্রীমন্ত কলিকাটা হাতে করিয়া উঠিয়া আপন মনেই কহিল—হরিলাল না কি? এল কখন?

গিরি ঘরের মধ্য হইতে আগ্নেয়-গিরির মতই অগ্ন্যুদ্গার করিল—দেখ আমি কিছু দানছত্র খুলি নাই।

শ্রীমন্ত আন্দাজেই তাল মারিল—নিশ্চয়ই।

তাই বল তোমার ভগ্নীপোতকে,—নিজে ষোল আনা বাঁধবেন, আমার অন্নধ্বংস করবেন, আর আমারই সর্ব্বনাশের চেষ্টা—ব'লে দাও ব'লছি ভাত আমার নাই।

শ্রীমন্ত কিন্তু এটা পারিল না। যতই ঘৃণা সে হরিলালকে করুক

কিন্তু একমুঠা ভাত,—না—তাহা সে মুখ দিয়া বাহির করিবে কি করিয়া? সে মৃদু স্বরে ক্ষীণভাবে কহিল,—তুমিই ব'লে দিয়ো।

—তোমার আক্কেল ত' খুব, আমি ওর সঙ্গে কথা কই যে কথা কইব!

শ্রীমন্ত বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সে শুনতে পেয়েছে ঠিক, আর ব'লতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে বেশ অধিকারভরা কণ্ঠে ডাকও আসিল, হরিলাল হাঁকিল—গৌরী, গৌরী, চ'লে আয় ব'ল্‌ছি, চ'লে আয়।

গৌরী ভয়ে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার সেই নিজের কথাটাই বোধ করি মনে পড়িয়া গেল, "যদি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় মা।" আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদ্গারী মুখও বন্ধ হইয়া গেল। চিরন্তন চলিত সমাজ-বিধান অনুসারে সন্তানের উপর পিতার অধিকার, তা সে পিতা যেমনই হউক না কেন, সে বিধান অমান্য করিবার মত জোর ওই তাহার নাই।

হরিলাল কিন্তু নিরস্ত হইল না, সে বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া দাবীভরা কণ্ঠে ডাকিল,—গৌরী!

শ্রীমন্ত ঘটনাটার মোড় ফিরাইয়া দিতে হাসিমুখে আপ্যায়ন করিল,—আরে ওস্তাদ যে, এলে কখন? তোমার ডাক শুনে তামাক নিয়ে—

হরিলাল ও প্রচ্ছন্ন অনুনয় গায়ে মাখিল না, সে বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই কহিল,—ছি-মন্তে, গৌরীকে দে দেখি।

আজ হরিলালের সম্মুখেও গিরির চাপা গলা শোনা গেল,—সে গৌরীর জন্য দুধে ভাতে মাখিতে মাখিতে কহিল—বল না সে ঘুমিয়েছে।

শ্রীমন্তকে আর কথাটা হরিলালের কানে তুলিয়া দিতে হয় না, সে নিজেই শুনিতে পাইল, উত্তরে সে কহিল;—ঘুমোক্, আমার মেয়ে আমায় দাও, ঢের হয়েছে, ঢের ভাত দিয়েছ, আর না।

এমন গম্ভীর ভাবে কথা কওয়া হরিলালের পক্ষে অস্বাভাবিক। ইহাতেই গিরি বেশী দমিয়া গেল। হরিলাল বকিয়াই যায়—ভাত, আরে ভাত দেখলাতা হামকো? ভাত? ভাত তো ঘাসকা বীচ, কেয়া দাম উস্‌কো? আর দেখলাতা কিনা একঠো আওরৎ। আরে তুল্‌সী দাস কেয়া বোলা জানতা,—

শিরকা তাজ, মরদকা মান,
জুত্তি আও জরু দুঁহি সমান।

পাঁওকা পঁয়জার তুম শিরমে উঠায়া?

কথাটা শ্রীমন্তকে বড় লাগিল, তাহার জিহ্বাগ্রে একটা কটু উত্তর আসিয়া পড়িয়াছিল—হ্যাঁ পরিবারকে যে খুন করতে পারে তার কাছে পরিবার 'জুত্তি' বই আর কি?

কিন্তু সন্তানকাঙালী মানুষটীরও যে নারীর মতই দুর্ব্বলতা আছে, কাজেই অন্তরের বিদ্রোহ অন্তরেই চাপিয়া তোষামোদ তাহাকে করিতে হয়। মহাজন আর খাতক এদের মধ্যে খাতকের যে ওই ছাড়া উপায় নাই।—

শ্রীমন্ত কষ্টহাসি হাসিয়া কহিল,—আরে ভাই ওস্তাদ, আওরৎ কি বাত্‌ ধরতে আছে, এস, এস তৈরী তামাক, তোমার সে বাত্‌টা কি হে—'তৈয়ার তাম্‌কুল, বিছাওনা, খানা,, মৎ ছোড়না'—না কি?

হরিলাল কহিল,—গৌরীকে এনে দাও।

গিরি পুনরায় ঘর হইতে কহিল, বলনা, রাত্রে কাঁদবে।

—কাঁদুক, কাঁদবে ব'লে ত হতচ্ছেদ্দায় মেয়েটাকে ফেলে রাখতে পারি না।

হতচ্ছেদ্দা! অকৃত্রিম স্নেহের এত বড় অপমান গিরির সহ্য হয় না,

সে লজ্জা সরম ভুলিয়া অতি তীব্র কণ্ঠে কহিল,—এত কাল ত' এই হতচ্ছেদ্দায় কাটল, আজ হঠাৎ বাপের স্নেহরস উথ্‌লে উঠল।

বলিয়া মেয়েটার হাত ধরিয়া হিড়্‌হিড়, করিয়া টানিয়া হরিলালের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়া কহিল—নাও, মেয়ে বিক্রী করগে যাও। তোমার এ স্নেহ-রস কেন উথলে উঠল, জানি না মনে করছ? সব জানি।

গিরির মাথায় ঘোমটা নাই, কণ্ঠস্বরে লজ্জার মৃদুতা নাই, সে বোধ করি তখন আত্মহারা।

এবার হরিলাল চুপ হইয়া গেল;—সংসারে অতি বড় পাষণ্ডেরও বিবেক বোধ হয় নিঃশেষে মরিয়া যায় না। তাই সে যে-অন্যায়, যে-পাপ পূর্ব্বে করে নাই, সে-পাপ করিবার পূর্ব্বে ধরা পড়িলে লজ্জা তাহার হয়-ই হয়। ওই লজ্জাই ত' সংসারে অন্যায়-বোধ, আর সে লজ্জা অনুভব করে মানুষের যে-সংস্কার তাহাই বিবেক।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া গিরির দিকে চাহিল, সে কথাটা বেশ বুঝিতে পারিল না, গিরি কহিল—তখন গৌরী ছিল ব'লে ব'লতে পারি নাই আমি। যে কথা পর, হ্যাঁ পরই ত' আমি, পর হ'য়েও আমি মেয়ের সামনে মুখে আনতে পারিনি সেই কাজ ও বাপ হ'য়ে ক'রবে ঠিক ক'রেছে। মেয়ে বিক্রী ক'রবে, কোথায় কোন বুড়ো খোঁড়া বর ঠিক করেছে, আজ একজন দেখতেও এসেছে। এই দেখ, একটা টাকাও সেঁ দিয়েছে গৌরীকে।

সে গৌরীর হাত হইতে টাকাটা কাড়িয়া লইয়া হরিলালের দিকেই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শ্রীমন্তের ভাবে ভঙ্গীতে একটা পরিবর্ত্তন খেলিয়া গেল, সে কঠোর দৃষ্টিতে হরিলালের পানে চাহিতে চাহিতে দৃঢ় ভঙ্গীতে গৌরীকে আপনার কোলের কাছে টানিয়া লইল।

সে দৃষ্টির ধিক্কারে এবং কঠোরতায় হরিলাল এতটুকু হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ না দিয়া পারিল না, লজ্জাও হইতেছিল, আর আশঙ্কারও সীমা ছিল না। শ্রীমন্তের ঐ চিম্‌ড়ে দেহ রক্ত-মাংসের ত' নয়, পাথর-লোহার। সে কহিল—মেয়ের ত' বিয়ে দিতে হবে, ভাল ঘর বর ত' অমনি হয় না, টাকা চাই।

গিরি গর্জ্জন করিয়া উঠিল—টাকার পুঁটুলী বুকে চাপিয়ে যাবেন, জমি র'য়েচে—

হরিলাল ব্যঙ্গ করিয়া উত্তর দিল,—জমিন্ কেন, জিমিদারী হ্যায়, ওহিঠো বেচেঙ্গে—

অপব্যয়ে, উচ্ছৃঙ্খলতায় সমস্ত খোয়াইয়া পথের ভিখারী হইয়াও যে মানুষ এমন নির্লজ্জ, সপ্রতিভ আস্ফালন করিতে পারে এ ধারণা গিরির ছিল না, কিন্তু শ্রীমন্তের ছিল, সে হরিলালকে চিনিত।

বিস্ময় তাহার হইল না, কিন্তু ঘৃণাভরেই সে কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, টাকা তোমার লাগবে না। যা খরচ হবে আমার,—বিয়ে আমি দেখে শুনে দেব।

তবু হরিলাল একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিল,—কুল, টুল দেখতে হবে, আমার কুল ভেঙে দেবে তোমরা,—

গিরির অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সে বোধ করি ওই লোকটার অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছিল, সে কহিল—বুঝতে পারছ না ও চামারের চালাকী, ওই সব আবোল-তাবোল ক'রে বিয়ে দেবার নাম ক'রে মেয়ে বেচবে।

হরিলাল এবার একটু সবল ভাবেই প্রতিবাদ করিল, কিন্তু গিরির কথার উত্তরে সে কথাটা একান্ত অবান্তর বোধ হয়। সে মনে মনে যুক্তি-সবল প্রতিবাদই খুঁজিতেছিল, কহিল,—আর আমার

মেয়ের বিয়ে তোমাদের টাকাতেই বা দিতে দেব কেন? আমার মান নাই,—

গিরি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, অতি শ্লেষতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের জ্বালায় ভরা—ও রে আমার মানী লোক, বলে—

সেই মানভূমের, মানকুণ্ডুর, মানসিংহী মহারাজ,
মানের গোড়ায় ছাইএর গাদায় বসে বসে সদাই লাজ।

সেই বিত্তান্ত—।

শ্রীমন্ত বেশ গম্ভীর ভাবেই কহিল—দেখ হরিলাল, ওসব মতলব ছাড়, গৌরীকে জলে ফেলে দিতে আমি দেব না।

গাম্ভীর্য্যের মধ্যে উত্তেজনা থাকে না। হরিলাল শ্রীমন্তের এই উত্তেজনাহীন গাম্ভীর্য্যকে ভ্রম করিল মৃদুতা বলিয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোষ হইয়া উঠিল প্রবল, সে বলিয়া উঠিল—আমার মেয়ে আমি যদি জলে ফেলে দি,—বলিয়া সে আগাইয়া আসিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া শ্রীমন্তের সন্নিকট হইতে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

গৌরী শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের কঠোর দেহখানা হইয়া উঠে সুকঠোর, প্রত্যেকটি পেশী যেন দৃঢ়ভাবে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, মুখ চোখ ঘৃণায়, ক্রোধে হইয়া উঠিল বীভৎস ভীষণ! সে একদৃষ্টে হরিলালের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনুত্তেজিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—খুন ক'রে ফেলব।

সংসারে উচ্ছ্বসিত ক্রোধকে মানুষ তত ভয় করে না; কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ সত্যই ভীতির বস্তু। উচ্ছ্বসিত ক্রোধ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোর প্রবল তিরস্কারেরই নামান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই বাক্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই শান্ত ক্রোধ প্রতিহিংসারই রূপান্তর, ইহার প্রকাশ প্রায়ই

কর্ম্মে। বাস্তবতঃ নিরীহ বন্দুকের গুলীর মত, যে কোন মুহূর্ত্তে ফাটিয়া জীবন সংশয় করিতে পারে। মানুষ ইহাকে ভয়ও করে বেশী, সব সময়ে এটা বিশ্লেষণ করিয়া না বুঝিলেও, মানুষের অন্তর এটা অনুভব করে। হরিলালও ভয় পাইল, সে গৌরীকে ছাড়িয়া দশ হাত পিছাইয়া গিয়া শ্রীমন্তের পানে চাহিয়া কহিল—আচ্ছা থাক্, কাল—

সহসা তাহার নজরে, গিরির ফেলিয়া-দেওয়া টাকাটা ঠেকিল, সে চট্ করিয়া টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া কথাটা শেষ করিল—পুলিশ এনে মেয়ে দখল ক'রব।

বাক্যশেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পা দরজার ওপারে পড়িল এবং এক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। বোধ হয় আড়ালে সে ছুটিতেই সুরু করিয়াছিল।

গৌরী বাপের এই পলায়ন-ভঙ্গীতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, গিরিও হাসিল। কিন্তু শ্রীমন্ত নীরব হইয়াই রহিল।

গিরি গৌরীকে টানিয়া লইয়া রান্নাঘরের মুখে পা বাড়াইয়া আবার ফিরিয়া কহিল—আমাদেরও আর দেরী করা নয়, শীগ্রি পাত্র দেখ।

শ্রীমন্ত ঘরের দাওয়ার উপরে বসিতে বসিতে শুধু কহিল, হুঁ।

গিরি কহিল—কি ভাবছ বল দেখি ?

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—ভাবছি সেই কথাটা, বলে যে সেই,

পরের সোণা প'রোনা কাণে
ছিঁড়ে নেবে হেঁচ্‌কা টানে।

নিজের একটা হ'ল না—

আর তাহার বলা হইল না, গিরি দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া যাওয়াতেই কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। শ্রোতার অভাবে, না—ঐ নারীটীর দ্রুত পদক্ষেপের ইঙ্গিতে তাহার মনের তুফানের পরিচয় পাইয়া, কে জানে!

সাত

রাত্রে গৌরীকে শোয়াইয়া দপ্ করিয়া আলোটা নিভাইয়া দিয়া গিরি শুইয়া পড়িল। গৌরী নিদ্রিতা। কিন্তু জাগ্রত দুটী প্রাণীও নীরব। অনেকক্ষণ পরে শ্রীমন্তই কথা কহিল—ঠিক বলেছ তুমি, আর দেরী করা নয়, যত শীগ্রি হয় বিয়ে দিতে হবে।

গিরি কোন উত্তর দিল না, শ্রীমন্ত পাশ ফিরিয়া গিরির পিঠের উপর হাত রাখিয়া কহিল,—রাগ করেছ গিরি-বৌ?

পিঠে হাত রাখিয়া শ্রীমন্ত অনুভব করিল গিরির দেহখানি ঘন ঘন কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, সে কহিল—সত্যি আমার দোষ হয়েছে, কেঁদনা গিরি।—

গিরি তবুও মুখ তুলিল না, শ্রীমন্ত এবার আরও একটু সরিয়া গিয়া গিরির মুখখানিং তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিল, কহিল—আমায় মাপ কর গিরি;—করবে না?

গিরি এবার আর থাকিতে পারিল না, সে উঠিয়া স্বামীর পা দুইটার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কহিল—ওগো আর আমার লজ্জার বোঝা বাড়িয়ো না গো, আমি যে এতেই তোমায় মুখ দেখাতে পারছি নে।

শ্রীমন্ত বুঝিল কিসের এ বেদনা। তাহারও এ বঞ্চনার বেদনা ছিল, কিন্তু এই নারীটী যে সে বঞ্চনার জন্য নিজেকেই দায়ী করিয়া অহরহ

বুকের মধ্যে এত ক্ষোভ এত শোচনা পোষণ করে তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই। আজ তাহার আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরম দুঃখের মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইয়া যে আঘাত আজ সে আপন অজ্ঞাতে দিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য গ্লানির আর পরিসীমা রহিল না। তাহার মুখে সান্ত্বনার কোন বাণী ফুটিতে পারিল না, বোধ করি মনেও জোগায় নাই। সে পরম স্নেহভরে প্রিয়তমার এলাইয়া-পড়া কেশের উপর হস্তের পরশ বুলাইয়া নীরবে সান্ত্বনা দিতে চাহিল।

গিরি আবার কহিল—আমি ত জানি, এর জন্যে কত বড় দুঃখ তোমার মনে ;—সেই লজ্জাতেই যে আমি ম'রে যাই। আমার মনে হয় কি জান, মনে হয় ছুরী দিয়ে আমার এ দেহখানাকে ফেড়ে ফেড়ে দেখি।—

শ্রীমন্ত আর এ উচ্ছ্বসিত দুঃখের আঘাত সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে কৃত্রিম আনন্দের ভান করিয়া, লঘু হাস্য-পরিহাসে বঞ্চনার বেদনার সত্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া গিরিকে ভুলাইতে গেল, সে কহিল —দূর, দূর, মিছেমিছি মাথা খারাপ করা দেখ, যত সব বাজে ভাবনা! হ্যাঃ, ছেলের জন্যে ত দুঃখে মরে গেলাম ; ছেলে অভাবে ত রাজ্য-পাট ভেসে যাচ্ছে—তাই ছেলে! ছেলে না হয়েছে ভালই হয়েছে, হাঙ্গাম কত, খাবে কি ?

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। গিরি স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—সে কণ্ঠস্বর অতি দীনতায় ভরা, প্রচ্ছন্ন আক্ষেপের তাহাতে সীমা নাই, ভিক্ষুককে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলে যে দীনতা, যে আত্ম-ধিক্কারের সুর তাহার ধীর পদক্ষেপে, চাহনিতে ফোটে, গিরির কণ্ঠেও ঠিক সেই সুর, সেই ধিক্কার,—সে কহিল—এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বল্লে!

শ্রীমন্ত বুঝিল না এ কথায় গিরি বেদনা পাইল কেমন করিয়া! কিন্তু গিরি বেদনা পাইয়াছিল, সে ত' সন্তানের আশা আজও ছাড়িতে পারে নাই, তাহার মনোমন্দিরে তাহার অন্তরের নারীটী অহরহ যে কল্পিত একটী শিশু-দেবতার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত! সত্য সন্তানের মাতাকে যদি পরম অভাবেও স্বামী এমন কথা বলে, তাহাতে যে বেদনা সে পায়, সেই বেদনা সে পাইয়াছিল।

তারপর সব নীরব। শ্রীমন্ত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল এমন কথা সে কি বলিল যাহাতে গিরি বেদনা পাইল।

আর ঐ নারীটী কি যে ভাবিতেছিল সেই জানে।

বহুক্ষণ পরে গিরিই শ্রীমন্তের কাছে সরিয়া আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিল—ঘুমোলে?

শ্রীমন্ত বেশী কথা কহিতে সাহস করিল না, সে সংক্ষেপে সাড়া দিল—উঁ!

গিরি বাহুপাশে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল—আমার একটী কথা রাখবে তুমি, বল?

শ্রীমন্তের ভয় হইতেছিল, কি কথায় হয়ত কি হইয়া যাইবে, সে কহিল—কি কথা বল।

আগে বল, রাখবে?

এবার শ্রীমন্ত গিরির দেহ বেষ্টন করিয়া সাদরে কহিল—তোমার কোন্ কথা রাখিনে বল?

—তা নয়, তিন সত্যি করতে হবে।

শ্রীমন্তের মনে কি হইল কে জানে, সে কহিল—না, আগে বল কথাটা ক, শুনি, তারপর।

তুমি আবার বিয়ে কর।

শ্রীমন্ত কথাটা শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না, বহুক্ষণ পরে মাত্র একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

স্বামার এ নীরবতার অর্থ গিরি বুঝিয়াছিল, কিন্তু বিচিত্র নারীর মন, আর বিচিত্র সম্বন্ধ নর ও নারীর মধ্যে। এ অনুরোধ হেলা করায়, বিশেষ, স্বামী এই প্রস্তাবে বেদনা পাওয়ায় গিরির একটু আনন্দই হইল। সে স্বামীকে আপনার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—রাগ হ'ল বুঝি? শোন, শোন।

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল, এ সংসারে আজ ছ'সাত বছর একসঙ্গে ঘর করছি, তুমি আমার সব চেয়ে বড়, এ কি তুমি জান না?

নারীটীর অন্তর পুরুষের সোহাগে পুলকে ফলিয়া ফুলিয়া উঠে, গিরি চটুল ভাবে কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর টানিয়া কহিল, তাই নাকি? কত বড় গো, তোমার ওই তেল-পাকা কাল হুঁকোটার চেয়েও বড়?

শ্রীমন্ত এবার স্ত্রীর গালে সোহাগের চড় মারিয়া কহিল—ভাগ্!

উত্তরে গিরি পরম সোহাগে স্বামীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তা জানি ব'লেই ত' এত দুঃখ এত লজ্জা আমার যে তোমার মনের খেদ মেটাতে পারলাম না।

শ্রীমন্ত তিরস্কার করিয়া কহিল, ফের ঐ কথা? তা হ'লে কিন্তু আমি উঠে যাব।

আচ্ছা থাক্, থাক্, এই মুখ বন্ধ করছি। বলিয়া সে স্বামীর অধরে আপন অধর আবদ্ধ করিয়া দিল। অতি পুলকে গিরি, স্বামীর নিকট হইতে আগে প্রেম নিবেদন পাইবার স্ত্রীর যে একটা মর্য্যাদা ও সলজ্জ রীতি আছে, তাহা আজ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

সহসা গৌরী ঘুমের ঘোরে শব্দ করিয়া নড়িয়া-চড়িয়া ওঠায় গিরি গৌরীর দিকে ফিরিয়া তাহার পিঠে ঘুমপাড়ানী চাপড় মারিতে মারিতে

কহিল—সত্যি আর দেরী ক'রো না, ওই ত বাপের ইচ্ছে, আর এদিকেও গৌরী যেটের কোলে ন' দশ বছরের হ'ল।

শ্রীমন্ত কহিল, পাত্র যে মনের মত মিলছে না, আমি কি বসে আছি ভাবছ? দু-তিন জন ঘটককে বলেছি, কত বন্ধুজনকে বলেছি। যার তার হাতে ত গৌরীকে দিতে পারব না।

রাঙা টুকটুকে ছেলেটী চাই বাপু, হর-গৌরীর মত মানান' চাই—।

—দুকলম লেখাপড়া জানা চাই, যে চাষাকে সেই চাষা, আমাদের মত হ'লে চলবে না, অন্ততঃ ছাত্তবিত্তি মাইনর।

—শ্বশুর শাশুড়ী ভাল চাই,—সে যে কষ্ট দেবে তা হবে না। বরং শ্বশুর শাশুড়ী না থাকে সে ভাল। গৌরীই ত ধর বাপের যা আছে তা পাবে।

—বাপের আছে ছাই, তবে হ্যাঁ, আমার ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে সে টুকুত পাবেই।

গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে, ক্ষণ-পরে কহে, তার চেয়ে দেখেশুনে দেওয়াই ভাল, সম্পত্তি কিছু দিয়ো, সব দিয়ো না, সময় গিয়েও ত মানুষের ছেলেপেলে হয়।

শ্রীমন্ত কহিল,—চল গিরি, এবার বদ্দিনাথ যাই, ধন্না দিলে বাবার কি দয়া হবে না!

গিরি কহিল,—তাই চল, গৌরীর বিয়েটা হয়ে যাক।

আট

শ্রাবণের মাঝামাঝি, কয়দিন হইতে তাহার উপর বাদলা করিয়াছে। আকাশ ভরিয়া জলভরা মেঘের দাপাদাপি। দুরন্ত বর্ষণে মানুষ ঘরের বাহির হইতে পারে না।

শ্রীমন্ত সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গিয়াছিল মহাজনের বাড়ী।

গৌরীর পাত্র মিলিয়াছে, যেমন ঘর, তেমনি বর। যেমনটী শ্রীমন্ত ও গিরি চাহিয়াছিল তেমনটী। মেলেনাই শুধু শ্বশুর-শাশুড়ীর কথাটা,— দুইই মজুত, তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না—তাহারা লোক খুব ভাল। এদিকে সুবিধাও খুব, তাহারা চায় মাত্র দুশো টাকা। তা এমন পাত্রের তুলনায় সে আর এমন বেশী কি!

কিন্তু পাত্রটীর মূল্য হিসাবে দু'শো টাকা হয় ত কিছু নয়, কারণ সমাজের হাটে তাহার কদর আছে, চাহিদা আছে। কিন্তু ক্রেতার সংস্থানের ঘরটী যে শূন্য, তাহার কাছে দুশো টাকা যে অনেক, নিঃশেষে রক্তহীন জনের কাছে দু'টী বিন্দু রক্ত!

কিন্তু কাঙ্গালের কি সাধ হয় না! আর সে সাধের জন্য যদি সে জীবন পণ করিয়া বসে!

শ্রীমন্ত গিরিকে কহিল—দেখ এক কাজ করা যাক্, গৌরীকে 'ত' কিছু জমি দোবই ঠিক করছি, তা ওই জমিটুকু বেচে-কেনে গৌরীর বিয়েটা দিয়ে দি;—কি বল?

গিরিও ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সেই ভাল, তবে জমিটা যদি ওরাই নিয়ে মেয়েটী নিত তবে ভাল হ'ত। গৌরীর ছেলে মেয়েরা নাম কর্ত্ত, মায়ের মামামামীর দেওয়া আমাদের। নইলে যতই কর ততই কর—

গৌরীর ছেলেরা আমাদের চিনবে না, শুভকর্ম্ম হবে,—আভ্যুতি দেবে সেই মাতামহ পাবে।

শ্রীমন্ত উৎসাহভরে কহে "তা না হয় 'দো'য়ের যে ছোট চারটুক্‌রো কেটে একবিঘে বাকুড়ি করেছি, সে বিঘে খানেক গৌরীকে দান করব। লিখে দোব 'কেনারামের জমির পশ্চিম, পুন্নচন্দের 'দো'এর উত্তর ও পূর্ব্ব, কালিকেষ্টর বাকুড়ির দক্ষিণ ইতিমধ্যে দোয়েম জমি—নাম গিরি বাকুড়ি, বুঝলে, নাম দিয়ে দোব গিরি বাকুড়ি। বাস্—আখ হবে, কলাই হবে, গম হবে, গৌরীর ছেলেমেয়েরা খাবে আর বলবে 'গিরি বাকুড়ির ফসল।' গিরি কে—না মায়ের মামী।

গিরি ঈষৎ লজ্জাভরে কহে—"তোমার নামটাও জুড়ে দাও আগে, দুজনেরই নাম থাকবে।

একটু চিন্তা করিয়া শ্রীমন্ত প্রবল উৎসাহে ঘাড় দোলাইয়া কহিল—তাই হবে, নাম দিয়ে দোব 'শ্রীগিরি বাকুড়ি', কেমন?

সমস্তটাই গিরিরও বড় মনে ধরিল।

শ্রীমন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সেদিন শ্রীমন্ত গিয়াছিল সেই দুশো টাকার জোগাড়ে। মহাজন জমি কিনিল না, শ্রীমন্তের সমস্ত ভূ-লক্ষ্মীটুকুকে বাঁধা লইয়া আড়াই শত টাকা শ্রীমন্তকে দিল। গৌরীকে দিবার জন্য হাতে পায়ে ধরিয়া ওই 'শ্রীগিরি-বাকুড়ি'টুকু শ্রীমন্ত দলিলের বাহিরে রাখিল।

শ্রীমন্তও খুসী হইল; তাহার ভরসা হইল তাহার সমর্থ দেহে খাটিয়া সে একদিন ঋণ শোধ করিয়া তাহার ভূমিলক্ষ্মী মাকে পূর্ণাঙ্গ রাখিয়াই পূজা করিতে পাইবে।

মহাজনের আশা—সুদের তন্তু বয়ন করিয়া একদিন সে শ্রীমন্তের সমগ্র জমিটুকু টানিয়া লইতে পারিবে।

যাক, শ্রীমন্ত যখন টাকা লইয়া বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ছায়ায় গাঢ় অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন কোন বিরাটপক্ষ নিকষ-কালো পাখী ধরণীর কেন্দ্র-দণ্ডের শীর্ষে বসিয়া অণ্ডের মত ধরণীকে বুকে ধরিয়া আছে। তাহার পক্ষতলে উত্তাপ নাই—আছে শুধু হিমানী স্পর্শ। তাহার সে পক্ষে ঝরে জল, আর সে পক্ষের আন্দোলনে জাগিয়া উঠে হিম তীক্ষ্ণ বায়ু-প্রবাহ। সে বর্ষণে আর বায়ু-প্রবাহে ধরণী শীতার্ত্তা! সিক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীমন্ত বাড়ী আসিয়া পৌছিল। ঘরে আলো নাই, বাড়ীতে মানুষের সাড়া নাই, শ্রীমন্ত পরম বিরক্তি ভরে কহিল—

বলি সব মরেছে, না কি?

অন্ধকারের মাঝে শ্বেতবস্ত্রাবৃত একটী মূর্ত্তি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীমন্ত বুঝিল গিরি।

শ্রীমন্ত কহিল—দিন ঠিক করে ফেল কাল, কালই খোলায় খই দাও। খুব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল—বুঝলে!

গিরি তবু কোন কথা কয় না।

গিরি কথা কহিল আর না কহিল তাহাতে শ্রীমন্তের কিছু আসে যায় না। সে দাওয়ার উপর বসিয়া কলিকা খুঁজিতে খুঁজিতে গোটা বিবাহের ফর্দ্দটা মুখে মুখে বলিয়া গেল—

—ভদ্দরলোকের সঙ্গে করণকর্ম্ম, ভদ্দরলোকই আসবে সব, রাত্তিরে লুচি করতেই হবে। তা ঘরের গম-ময়দা পিষে নাও, আর ছোলার ডাল তাও ঘরে আছে। 'আর গুড়,—তা হোক, এবার আমার যা গুড় হয়েছে চিনি ফেলে তা খেতে হবে। না হয় চিনি কিছু আনা যাবে। কথা বিশ্বাস না হয় বিয়ের রাত্তিরেই পরখ করিয়ে দোব তোমাকে, তারা গুড়ই যদি না চায়—

এতক্ষণ গিরি অতি মৃদুভাবে দুটী কথা কয়—কার বিয়ে ?

—কার বিয়ে ? বলে যে সেই সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতে রামের কে ? যাঃ গেল, ঘরে আলো কি হ'ল, কয়লা ধরাব যে, দেশলাইটা দাও ত। বলে কার বিয়ে ? আমার নানার বিয়ে—কেন গৌরীর বিয়ে !

গিরি কাঁদিয়া উঠে, কহে—তাই ত বলছি গো, কার বিয়ে দেবে ? গৌরীকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে !

—কেড়ে নিয়ে গিয়েছে ? কে ? কেন ?

—যার মেয়ে, সেই মাতাল বদমাস ; আজ তার বিয়ে দেবে। পাত্রটীর দুচোখ কাণা, বিয়ে দিয়ে টাকা পাবে। তাছাড়া তিনকুলে সে পাত্তরের এক বোন আর বোনাই ছাড়া কেউ নাই, বিষয়সম্পত্তি আছে ভাল।

শ্রীমন্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

গিরি কাঁদিতেছিল, রোদন-ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই সে কহিল—তুমি গেলে, তার দণ্ড দুই পরেই সে এসে হাজির, সঙ্গে চার পাঁচ জনা লোক। বল্লে 'ভালোয় ভালোয় মেয়ে দেবে ত দাও নইলে খুঁটাতে তোমাকে বেঁধে জুতো মেরে মেয়ে নিয়ে যাব। গাঁয়ের দুচার জন এল, তাদের কি সব বল্লে, তারা বল্লে, তা ওর নিজের মেয়ে ও নিয়ে যাবে তাতে কে কি বলবে বাপু এতদিন তোমাদের কাছে রেখেছে এই'—

সহসা শ্রীমন্ত উঠিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কোথায় বিয়ে ?

—মহাদেবপুর।

মহাদেবপুর এখান হইতে ক্রোশ তিনেক পথ।

শ্রীমন্ত রান্না-ঘরের মাচায় তোলা একগাছা লাঠি টানিয়া লইয়া কহিল—চল্লাম।

গিরি চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহে—সেকি কোথা যাবে

—ফিরে আসি সেই শালা হ'য়ের মাথাটা চেলিয়ে।

—সেকি, তার মেয়ে !

"তার বাবার মেয়ে"—বলিয়া গিরির হাত সজোরে ছাড়াইয়া সেই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে শ্রীমন্ত বাহির হইয়া গেল।

গিরি বাহিরের দুয়ার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে ডাকিল—ওগো, ওগো !

কোথায় কে !

দুয়ারের দুইপাশের বাজু দুইটা আশ্রয় করিয়া গিরি বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

আঁকা-বাঁকা পল্লী-পথখানি হাত দশ বারো দূরে গভীর অন্ধকারের মাঝে লীন হইয়া গেছে। সে অন্ধকারে তাহার অশ্রু-সজল দৃষ্টি বারবার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বর্ষণ ও বায়ুতে গাছে গাছে, ঘরের চালে চালে একটা শব্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে।

পাশের বড় গাছটায় কয়টা পক্ষীশাবক আর্ত্তভাবে চিঁ-চিঁ করিয়া ডাকিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পিতামাতার পক্ষ-প্রসারণ ও সঙ্কোচনের শব্দ পাওয়া যায়, তাহারা বুঝি শাবক কয়টীকে বুকে টানিয়া লইল।

বিপুল অন্ধকার! দিকে, দিগন্তে, উর্দ্ধে—কোন দিকে কোথাও আলোক-রশ্মির এতটুকু রেখার এতটুকু আভাষ নাই। মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরিয়া আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের রেখা ঝলক দিয়া যায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিন্নি ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া একটী কোণে চুপ করিয়া বসিল।

তাহার মনের যত রোষ গিয়া পড়িল আজ ওই ভাগ্যহতা মেয়েটা, ওই গৌরীর উপর। কি একটা কুগ্রহের মত তাহার অদৃষ্টাকাশে সে

আসিয়া জুটিয়াছিল। সমস্ত সংসারটা তাহার একদিনে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। আর রোষ পড়ে তাহার নিজের উপর, তাহার নিজের একটা হইলে ত আজ—

একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস তাহার বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়িল। সহসা সে, কে জানে কেন, আপন যৌবন-পরিপুষ্ট দেহখানা কঠিন ভাবে নিপীড়ন করিল—বুঝি সে বুঝিতে চাহিতেছিল কোথায় সে অঙ্গহীনা।

নয়

অন্ধকার!

হাত দিয়া সে অন্ধকার স্পর্শ করা যায় বোধ হয়।

তাহার উপর অজস্র বর্ষণ, এলোমেলো বাতাস বর্ষণের শৈত্যকে অসহ, তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সে শৈত্যে ধরণী পর্য্যন্ত আর্ত্ত হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিথর অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার বুকের আবরণ-মাটী শিথিল, গলিত হইয়া গেছে।

সেই বর্ষণ, বাতাস আর সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়াছে শ্রীমন্ত। উন্মত্ত যে, সেও যদি এই বর্ষণ-মুখর অন্ধকারের মধ্যে চলে, তবে দেহের যাতনায় অস্থির হইয়া উঠে।

কিন্তু শ্রীমন্ত চলিয়াছে দৃঢ়ভাবে একটা দিক লক্ষ্য করিয়া। মুখ দিয়া ঘন ঘন পড়ে দ্রুত-গমন-হেতু গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস; হাতে লাঠি, মাথায় জড়ান এ'খানা চাদর। কিছু দূর যায় আর একবার দাঁড়াইয়া দিক ঠিক করি, আবার চলে।

জলকাদার পথে বিপথে ঘুরিয়া সে শেষে মহাদেবপুরে মধ্য রাত্রির

পূর্ব্বেই আসিয়া পৌছাইল। খোঁজ করিয়া সে রামদাস ঘোষ, পাত্রের ভগ্নীপতির বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

যাক্, তখনও বিবাহ হয় নাই, শেষরাত্রে লগ্ন।

বাহিরে একটা লণ্ঠনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই আলোয় একটা কম্বলের উপর আসর জমাইয়া বসিয়া আছে হরিলাল স্বয়ং।

শ্রীমন্ত আসিয়া হরিলালের মাথা ফাটাইয়া দিল না, সে একেবারে তাহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল—ওস্তাদ, গৌরীর পানে তাকাও, না হয় তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল।

হরিলালও এ আকস্মিক আর্ত্তভিক্ষায় কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখে আজ হিন্দি-বাত ফুটিল না. সে কহিল——তাই ত টাকা নিয়েছি যে—

—কত টাকা নিয়েছ ? ফেরৎ দাও টাকা।

—সে টাকা কি আর আছে ? দেনা ছিল, বডি-ওয়ারেণ্ট ধরিয়েছিল, তাই—

শ্রীমন্তের মনে পড়িল মহাজনের বাড়ী যে-চাদর সে ঘাড়ে করিয়া গিয়াছিল সে-চাদর তাহার মাথায় বাঁধা, আর তাহাতে আড়াই শত টাকা বাঁধা আছে।

সে হরিলালের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল – কত টাকা ? আমি এখুনি দিচ্ছি, কত টাকা ?

হরিলাল তখন ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে তখন নিজের জন্য সম্ভবমত লাভ যোগ দিয়া অঙ্ক স্থির করিতেছিল, হিসাব করিয়া নিজের জন্য গোটা ত্রিশ টাকা রাখিয়া সে কহিল—দেড় শো টাকা।

শ্রীমন্ত সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আমি দিচ্ছি, দাও ভাই ে .কে আমাকে দাও, আমি দেখে শুনে ওর বিয়ে দোব, ভিক্ষে চাইছি আমি—

বলিয়া সে মাথায় চাদর খুলিয়া টাকা-বাঁধা খুঁটটা বাহির করিল। টাকায় ভারী খুঁটটা সশব্দে মাটীর উপর পড়িল।

হরিলালের চোখ দুইটা লোলুপতায় জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল, আফশোষ হইল কেন সে বেশী করিয়া বলিল না।—মুহূর্ত্তে এক মতলব ভাঁজিয়া তাড়াতাড়ি সে কহিল—কিন্তু এরা? এরা আবার কি বলে দেখি?

বলিয়া সে পাত্রের অভিভাবক ভগ্নীপতি রামদয়ালের উদ্দেশ্যে উঠিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই রামদাস নিজে আসিয়া শ্রীমন্তকে অভ্যর্থনা করিল—তা বেশ, তাতে আর আমাদের আপত্তি কি? উনি নেহাৎ ধরেছিলেন তাই, নইলে ধরুন গিয়ে কন্যে আমাদের গেরামেই ঠিক রয়েছে। আজই রাত্রে আমরা বিবাহ দিতে পারব। তা আমাদের টাকাটা আর খরচা, ধরুন গোটা পঞ্চাশেক—টাকাটা পেলেই, হেঁঃ—হেঁঃ—

বলিয়া বিনীত বিকশিত হাসি দিয়া সে শ্রীমন্তকে মুগ্ধ করিয়া দিল। নাঃ—এরা সত্যই ভদ্রলোক! কিন্তু উপায় নাই, পাত্রটী যে কাণা—অন্ধ!

শ্রীমন্ত কহিল—তাই দেব আমি, গৌরীকে নিয়ে এস, টাকা গুণে নাও।

রামদাস উঠিয়া গেল, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হরিলালের সঙ্গে ফিরিয়া আসিল, হরিলালের কোলে ঘুমন্ত গৌরী। চেলী-পরা ঘুমন্ত গৌরীর মাথাটী এলাইয়া পড়িয়াছে, হরিলাল শ্রীমন্তের কোলে তাহাকে তুলিয়া দিল। শ্রীমন্ত ডাকিল—মা-মণি!

—উঁ।

শিশুটীর ঘুমন্ত কানেও এ ডাক ব্যর্থ হইয়া ফিরিল না। গৌরী ঘুমঘোরেও মামার ডাকে সাড়া দিল, উঁ।

এমনি ঘুমঘোরে সাড়া দেওয়া তাহার অভ্যাস ছিল ;—প্রায়ই রাত্রে খাবার সময় গৌরী ঘুমাইয়া পড়িলে গিরি যখন ঝঙ্কার দিত, শ্রীমন্ত তখন এমনি করিয়াই তাহাকে ডাকিত—মা-মণি !

গৌরী সাড়া দিত—উঁ !

শ্রীমন্ত তখন সুরু করিত—শোন তারপর, সেই যে সেই রাজপুত্তুর।

হরিলাল কহিল—টাকাটা দে ছিমন্ত ! এদের আবার বিয়ের যোগাড় আছে।

হাঁটু দিয়া ঘুমন্ত গৌরীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শ্রীমন্ত গণিয়া দুশো টাকা দিয়া, বাকী টাকাটা খুঁটে বাঁধিল, তারপর গৌরীকে ডাকিল—মা মণি, একবার উঠত মণি।

হরিলাল কহিল—হামকো ত কুচ্ মিল না চাহি ভাই, গাঁজা ভাঙ পিয়েগা, দেখো, হামারা সন্তান—

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল,—ভাগ্,—চল তুমি আমার সাথে চল, আমার বাড়ীতে তোমার কায়েমী বন্দোবস্ত, যা চাই তোমার।

হরিলাল কহিল,—নেহি ভাই, নগদ মূল যেৎনা মিলে ওহি লাভ। আর যে রায়বাঘিনী তোর ঘরে বাবা !

মোট কথা হরিলাল ছাড়িল না, আর পাঁচটা টাকা সে আদায় করিয়া লইল।

শ্রীমন্ত টাকা দিয়া গৌরীকে বুকে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তবে আমি চল্লাম—

রামদাস প্রবল আপত্তি তুলিয়া কহিল,—সে কি হয় ? না, সে হ'তে পারে না। এই দুর্য্যোগে ওই দুধের মেয়ে মরে যাবে যে। তা ছাড়া, ধরুন আমার বাড়ীতে একটা কাজ আজ ; আমাদের উপর কনে ত' ঠিকই আছে।

হরিলাল কহিল,—জরুর মর যায়েগা ; শালা—বন্ বন্ হাওয়া কন্ কন্ হাড়—ইসমে লেড়কী মর যায়গা।

শ্রীমন্ত বিপন্ন ভাবে কহিল,—তবে ?

রামদাস কথাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল—অবিশ্বাস হচ্ছে কি আমাদের ওপর !

ইহার উত্তরে 'হ্যাঁ অবিশ্বাস হইতেছে' এ কথা ত' বলা যায় না। শ্রীমন্তকে কাজেই লজ্জিত ভাবে অস্বীকার করিতে হইল—না—না—তা নয়।

রামদাস কহিল,—ধরুন, আমরা যদি মেয়ে না ছাড়তাম, তবে কি করতেন আপনি ? আইনেও কিছু করতে পারতেন না ; জোরেও কিছু করতে পারতেন না—গাঁ তো আমাদের।

—তা তো বটেই, তবে কিনা গৌরীর মামী—

হরিলাল কহিল—কাঁদবে। তা কাঁদুক, এক রজনী তোমার ছিমতী বিরহে কাঁদুক্ ছিমন্ত কাঁদুক্।

শ্রীমন্ত হাসিয়া ধমক দিয়া কহিল—ভাগ্, ফক্কড় কোথাকার।

রামদাস কহিল—তা উনি সে কথা বলতে পারেন বৈকি, ধরুন উনি হলেন আপনার তেনার নন্দাই। রাইএর যত রস-কথা সব হল ননদের সঙ্গে ; গানই আছে—ননদিনী ব-লো নাগরে। হেঁঃ—হেঁঃ—বলতে উনি পারেন বৈকি।

অগত্যা গৌরীকে পাশে শোয়াইয়া শ্রীমন্ত তাহার পাশে বসিল।

রামদাস এবার জোড় হাত করিয়া কহিল—তা হলে অনুমতি করুন একটুকুন জল-সেবা হোক। আর কাপড় একখানা ছাড়ুন।

সত্য, এ দুইটার প্রয়োজন একান্ত ভাবে শ্রীমন্ত অনুভব করিতেছিল। সারাটা দিনের ও এই অর্দ্ধ-রাত্রির সমস্ত দুর্য্যোগ মাথার উপর দিয়া

গিয়াছে ; তাহার উপর পরিশ্রমে—পরিশ্রম ইহাকে বলা চলে না, ইহাকে বলে শরীরের উপর অত্যাচার, দারুণ অত্যাচার,—সমস্ত দেহখানা যেন লতার মত এলাইয়া এলাইয়া পড়িতেছিল। সর্ব্বোপরি ক্ষুধার জ্বালা আর এই হিমানী-মাখানো সিক্ত বস্ত্রখানা তাহার সর্ব্বদেহে যেন মৃত্যুর স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল।

শ্রীমন্ত কৃতার্থ হইয়া গেল—সে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পর্য্যন্ত একবার 'না' করিল না, সঙ্গে সঙ্গে কহিল—আজ্ঞে বড় ভাল হয় কিন্তু।

—দেখুন দেখি, দেখুন দেখি, বিলম্ব আমারই অন্যায়। বলিতে বলিতে রামদাস উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে হরিলালও গেল।

নীরবতা ঘনাইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে দেহখানা ভাঙিয়া পড়ে—চোখ দুইটাও টানিয়া কে যেন জুড়িয়া দিতে চায়।

—গা তুলুন।

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল রামদাস, হাতে খাবারের পাত্র ; এ-কাঁধে কাপড়, ও-কাঁধে একখানা আসন।

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

ভিজা কাপড়খানা ছাড়িতেই শুষ্ক বস্ত্রের সুখস্পর্শে সমস্ত দেহখানা যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, শুষ্কতার মধ্যে যে উষ্ণতা সঞ্চিত থাকে সেই উষ্ণতা স্পর্শে দেহে যেন রক্তধারায় প্রবাহ ধরিল ; গায়ের চামড়ার অসাড়তা ঘুচিতে লাগিল। তারপর আহার—মুড়ী, মুড়কী, চিঁড়ে, দই, সন্দেশ, কয় কোষ সুমিষ্ট কাঁটাল, তাহার উপরে সদ্যতপ্ত কয়খানা লুচি !—বিলাসের আহার, সে শুধু পঞ্চরস-পরীক্ষাহেতু, কিন্তু দেহ-যন্ত্রের প্রয়োজনে অন্তরাত্মা যখন চীৎকার করে তখন সে ক্ষুধা, সে ক্ষুধার আহার সত্যকার আহার, সে আহার দেখিবার বস্তু, সে রস বাছে না, সে চায় বস্তু। সে আহারের তৃপ্তিতেই ধরণীর শস্যসৃষ্টি সার্থক, গৃহস্থের আতিথেয়তা

পুণ্যযুক্ত হইয়া উঠে। বোধ করি শ্রীমন্তের সেই অন্তরাত্মার ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে পরম তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া যখন উঠিল তখন দেখিল কিছু গুরু ভোজন হইয়া গেছে, ক্ষুধার তাড়নায় মাত্রা বজায় থাকে নাই।

রামদাস কহিল,—এই ঘরে আপনি মেয়ে নিয়ে গা গড়ান, আমি একটু আগুন আনি।

শ্রীমন্ত গৌরীকে তুলিয়া কম্বলটা ঘরে পাতিয়াই তাহার উপর গড়াইয়া পড়িল। পরিশ্রমের পর পরিচর্য্যায় মানুষের অবসাদ ঘন আসন্ন হইয়া উঠে।

রামদাস আসিয়া হুঁকাটী আগাইয়া দিয়া কহিল,—টানুন।

তারপর সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অপর হাতখানি বাহির করিয়া কহিল, —দেখুন, সেবা করবেন? শরীরটা একটু গরম হবে।

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল গাঁজা। সে এবার বেশ সজাগ হইয়া উঠিল, রামদাস গাঁজার কলিকাটী মাটীতে বসাইয়া আধ-তৈয়ারী গাঁজাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া টিকা ধরাইতে বসিল।

শ্রীমন্ত এবার ভক্তিমন্ত হইয়া উঠিল; এই জিনিষটুকুর সত্যই তাহার পরম প্রয়োজন ছিল।

কলিকায় গাঁজা চড়াইয়া শ্রীমন্ত রামদাসের দিকে আগাইয়া দিতেই সে জোড়হাত করিয়া কহিল—মার্জ্জনা করবেন, আমি ও পান করি না। আপনি সেবা করুন।

শ্রীমন্তের চোখ দুইটা বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিল, সে কহিল,—তবে।

রামদাস হাত কচলাইতে কচলাইতে পরম বৈষ্ণব বিনয় সহকারে কহিল, আজ্ঞে ওস্তাদের মুখে শুনলাম কিনা যে নিয়মিত পান আপনার [illegible]স—তাই।

শ্রীমন্ত কলিকাটায় টান মারিতে মারিতে ভাবিতেছিল সত্যই রীতি-মত ভক্তির পাত্র রামদাস, প্রায় দাতাকর্ণের সমতুল্য !

রামদাস কহিল, ওস্তাদ আপনার একবার আমাদের হয়েই ওপাড়া গেলেন সেই কন্যাটার বাড়ী। বেশ বক্তা লোক। ধরুন এই রাতেই ত বিয়ে ঠিক করতে হবে।

শ্রীমন্ত একটা পূরা দম লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত ঢুলিতে ঢুলিতে রহিয়া রহিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

রামদাস হাসিয়া কহিল,—ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস—তাই হয়েছে আমার ;—নইলে দেবদুল্লভ দ্রব্য।

শ্রীমন্তের আনন্দটা বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সে পরম আনন্দে গান ধরিয়া দিল—হুঁ—হুঁ—দেবদুল্লভ—সত্যিই দেবদুল্লভ, শিব-বন্দনার গানে আছে—

ও গাঁজা তোর পাতায় পাতায় রস
গাঁজা খেয়ে পাগ্‌লা ভোলা কালিমায়ের বশ।

পুনরায় সে একটা প্রাণ ভরিয়া দম দিল। অতঃপর রামদাস কি বলিয়া যায়, সে কথাগুলা আর তাহার কানে ভাল যায় না। দেহের অবসাদও যেন বড় আসন্ন হইয়া হইয়া উঠে। সে চোখ মুছিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে একহাতে বিছানা হাতড়াইতে লাগিল আর আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া কহিল,—গৌরী, গৌরী, বালিশটা দেত মা, বা-বালিশ।

রামদাস হাঁ হাঁ করিয়া ঠোঁটে তালুতে আক্ষেপের চুক্ চুক্ করিয়া শ্রীমন্তকে সজাগ করিয়া কহে—আহা—জিনিষটা মাটী হ'ল, আছে আছে ম..রও একটান দিব্যি হবে।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কলিকাটা বাগাইয়া ধরিয়া টান দিতে দিতে কহিল—এলা বিয়ে এবার দোব গৌরী-মার—, সেই গৌরী বেটী কনে, শিবে বেটা বর, ঝুম কুড়া কুড়—বাক্যিটা মুখেই রহিয়া গেল, শ্রীমন্ত কলিকা হাতেই ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

রামদাস কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ঈষৎ একটু হাসিয়া গাঁজার কলিকা আগুন সাবধান করিয়া, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। হরিলাল পাশ হইতে বাঁকা বকের মত গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ফেলাট হো গিয়া ?

রামদাস কহিল—হবে না ? দুটী ইয়া বড় সুপক্ক ধুত্রার বীজ মিশ্রিত করে দিয়েছি। কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বোধ হয় আর চৈতন্য—বলিয়া বেশ মৃদু গম্ভীর ভাবে 'না'র ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কথা শেষ করিল।

হরিলাল কহিল—এইবার তা হ'লে মেয়েটাকে—

রামদাস বলিল—হ্যাঁ।

শেষ রাত্রে একটা প্রবল গর্জ্জনে শ্রীমন্ত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।—মাথার ভিতরটা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল। বাহিরের বর্ষণ-শব্দ, বাতাসের হু হু রব কানের মধ্যে আসিতেছে, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে সে শব্দের অনুভূতি যেন তন্দ্রা-ঘোরে ;—তন্দ্রাটা আবার ধীরে ধীরে গভীর হইয়া আসে, সে পাশ ফিরিয়া আরাম করিয়া শুইল।

সহসা বর্ষণ-বাতাসের শব্দ চিরিয়া একটা উচ্চ সুডৌল তীক্ষ্ণ শব্দ ভাসিয়া উঠিল। শঙ্খধ্বনি ! আবার !

সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের হুলুধ্বনি। সমস্বত শব্দে আচ্ছন্ন শ্রীমন্তের সংবিৎ সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার এবার সব মনে পড়িয়া গেল ; ওঃ,

এদের বিবাহ তাহা হইলে হইতেছে। সে তাড়াতাড়ি গৌরীকে কোলের কাছে টানিয়া লইতে হাত বাড়াইল, হাত পড়িল মাটীতে; এ পাশ, ও পাশ, সকল পাশই খালি, গৌরী নাই!

মুহূর্ত্তে একটা সন্দেহ তাহার অবসাদ-আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মত চিড় খাইয়া জাগিয়া উঠে, সে-বিদ্যুতের আগুনে, তাহার মস্তিষ্কের উপর আচ্ছন্নতার যে একখানি আবরণ ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। সে লাফ দিয়া উঠিয়া গিয়া দরজাটা সবলে টানিল; বাহির হইতে দরজা বন্ধ!

নির্ম্মম নিষ্ঠুর বঞ্চনার ক্ষোভে মানুষের বুকে জাগে উন্মত্ত প্রতিহিংসা, সে-প্রতিহিংসায় মানুষের ভিতরের সকল শিক্ষা সভ্যতার আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া পশুত্ব যে দুর্নিবার ক্রোধে ও উন্মত্ত আত্মহারা-শক্তিতে জাগিয়া উঠে, সে-ক্রোধের মুখে সমস্ত দুনিয়া, এমন কি নিজের জীবনের উপরে পর্য্যন্ত মানুষের মমতা থাকে না। তখনকার শক্তি মানুষের বিস্ময়ের বস্তু।

সেই ক্রোধ, সেই শক্তি তখন শ্রীমন্তের পাথরের মত দেহে ক্রিয়া করিতেছিল। তাহার কাছে ঐ পল্‌কা দরজা জোড়াটা কতক্ষণ! বিপুল শক্তিতে চাড় খাইয়া দরজাটা শিকলের গোড়ায় কাটিয়া গেল; আর এক আকর্ষণে দরজাখানা দুভাগ হইয়া গেল; শিকলটাও খসিয়া গেল।

লাঠী-গাছটা কুড়াইয়া শ্রীমন্ত চলিল ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া—দ্রুত, দৃঢ়, অথচ নিঃশব্দ পদক্ষেপে।

এক পাশে একটা আলোকের ধারা দেখা যাইতেছিল; শব্দগুলাও ঠিক ঐ দিকে; শ্রীমন্ত দেখিল সেইটাই বাড়ীর ভিতরের বাহির দরজা। সেখান হইতে সমস্তই দেখা যাইতেছে,—

সম্মুখেই উঠানের উপর ঘরের বারান্দায় বিবাহের মণ্ডপ; ও পাশ

বসিয়া রয়, সম্মুখের আলো তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে,—কালো কদাকার চেহারা,—কি বীভৎস! চক্ষুদুটির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, আছে শুধু জলসিক্ত দুটী পঙ্কিল গহ্বর, তাহাতে অনর্গল মৃদু জলধারা গড়াইতেছে। ঐ যে তাহারই পাশে বসিয়া লাল-চেলাতে মোড়া ঘুমন্ত গৌরী, তাহার ছোট হাতখানি ওই অন্ধের হাতের উপর ধরিয়া আছে হরিলাল। শীর্ণ ক্রুর মুখে তাহার হাসির রেখা, বোধ হয় ওপাশের কুটুম্বগণের সঙ্গে পরিহাস চলিতেছে।

শ্রীমন্তের স্তম্ভিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল একটা অদ্ভুত শব্দ, রোষ ও রোদনে জড়িত একটা অভিব্যক্তি, ঠিক যেন আঘাতে মরণোন্মুখ দুর্দ্দান্ত পশুর ক্রোধ ও যাতনার গর্জ্জন!

ঐ শব্দে হরিলাল চমকিয়া কন্যার হাত ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অভিপ্রায় ছিল তাহার পলাইবার।

কিন্তু সম্মুখেই তখন শ্রীমন্ত; সে তাহার হাতের লাঠী ওই দারুণ ক্রোধে হরিলালের মাথায় নির্ম্মম ভাবেই বসাইয়া দিল।

চারিদিক হইতে একটা কলরোল উঠিল,……

শ্রীমন্ত তখন আবার লাঠী উঠাইয়াছে ওই কদাকার, চক্ষুহীন, নিরীহ জীবটীর উপর; গৌরী সে কলরোলে জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মামা-গো!

আর ঐ কদাকার চক্ষুহীন ছেলেটী চঞ্চল অবস্থায় অসহায়ের মত দৃষ্টিহীন চক্ষু লইয়া চারিদিকে চাহিল।

শ্রীমন্তের হাতের লাঠি অবশ হইয়া গেল, তাহার বড় করুণা হইল, হায় ঐ অসহায় জীবটিরই কি দোষ!

গিন্নি সেই দাওয়াতেই বসিয়া ছিল।

সকল ভাবনা তাহার ডুবিয়া গিয়াছে। সে ভাবিতেছিল শুধু, তাহার

যাহা আছে তাহাও কি যাইবে? ওই দুর্দ্দান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটাকে তাহার চেয়ে ত কেউ বেশী চেনে না; সে ত জানে ঐ লোকটার কি শক্তি। তাহারই প্রাণের আবরণে না হয় সে দুর্দ্দান্ত শান্ত হইয়া আছে, কিন্তু আজ যখন তাহার হাত ছাড়াইয়া, তাহার মমতার সকল আবরণ ছিন্ন করিয়া উন্মত্তের মত সে ছুটিয়াছে, তখন যে সে কি করিয়া ঘরে ফিরিবে, সে ত গিরির চোখের উপরেই ভাসিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল :—হয় খুন করিয়া ফিরিবে, নয় খুন হইয়া থাকিবে, রক্তাক্ত শ্রীমন্ত তাহার চোখের উপর বিভীষিকার মত নাচিতেছিল।

ভোরের আলো তখন ফুটি-ফুটি করিতেছে।

গিরির সারা রজনীর জাগ্রত স্বপ্ন বাস্তব হইয়া ঘরে ফিরিল। রক্তাক্ত দেহে শ্রীমন্ত লাঠীগাছটা ফেলিয়া দিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া কহিল—খুন করেছি চণ্ডালকে।

গিরির মুখে বাক্য সরিল না, কপালে করাঘাত করিতে তাহার হাত উঠিল না, তাহার কণ্ঠ হইয়া গেছে মূক, অঙ্গ হইয়া গেছে অসাড়, মাটীর মূর্ত্তির মত বসিয়া সে ভাবিতেছিল একটা কথা—তারপর!

শ্রীমন্তই কথা কহিয়া যাইতেছিল, এবার তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া গেল, চোখে জল;—সোনার প্রতিমাকে আমার মরণের হাতে তুলে দিলে গিরি, দেখনি তুমি, সে পাত্র ত নয় যেন জ্যান্ত মরণ। সব অন্ধকার তার।

আবার ক্ষণেক পরে আক্রোশ-ভরা কণ্ঠে কহিল—মেয়ে বেচে টাকা নেওয়ার সাধ তার মিটিয়ে দিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকরুণ তিরস্কারের সুরে গিরি কহিল—তারপর?

এখনও তারপরের ভাবনা শ্রীমন্তের মনে জাগে নাই, সে কহিল, তারপর আবার কি? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—

গিরি কহিল, সে ফল ত তুমি ভোগ করবে ফাঁসীকাঠে, আর আমি—

সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত শুম্ হইয়া গেল, এতক্ষণ পরে তারপরের ভাবনাটা বুঝি সে ভাবিতে বসিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গিরি উঠিয়া কাপড়, গামছা, ঘটিতে জল লইয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল—নাও, হাত মুখ ধোও, কাপড় ছাড়।

শ্রীমন্তও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ধুই, ছাড়ি। শিথিল হস্তে গিরির হাত হইতে ঘটীটা লইতে লইতে শ্রীমন্ত কহিল—আচ্ছা ওই কানার হাতেই যদি পড়বে, তবে ভগবান আমার গৌরী-মাকে এমন সুন্দর ক'রে কেন গড়েছিল বল দেখি?—বলিয়া সে গিরির মুখের পানে চাহিল।

গিরি রুদ্ধকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ব'লো না, ব'লো না, তার নাম আমার কাছে ক'রো না, তার বিচার নাই, বিচার নাই। হয় তো বা সে নিজেই নাই।

গিরির ভোরের আশঙ্কা সফল হইল।

বৈকালের দিকে থানাপুলিশে ঘর ভরিয়া গেল। সঙ্গে রামদাস, আর মাথায় ফেটা-বাঁধা হরিলাল।

শ্রীমন্তের হাতে দড়ি পড়িল, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 'হত্যার চেষ্টা, কন্যা রাহাজানির চেষ্টা, চুরি, আরও তিন চারিটা', ফৌজদারী ধারার ধারা আর শেষ হয় না। অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়া শ্রীমন্ত অবাক হইয়া উপরের পানে চাহিল। অনন্ত শূন্যতায় ভরা আকাশ, কিন্তু ঐখানেই মানুষের প্রাণ-ঢালা অহেতুকী বিশ্বাস! দুঃখে ঐখানে চোখ রাখিয়া সে বেদনা জানায়, আশ্বাস চায়, মর্ম্মদাহী শোকে ঐ

আকাশপানে উদাস মনে চাহিয়া সান্ত্বনা চায়, সবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল ঐ আকাশপানে চাহিয়া প্রতীকার চায়, ভক্তি জানায়, মার্জ্জনা চায়, কিছু পায় কি না কে জানে কিন্তু মানুষ চিরদিন ঐ শূন্যতার মাঝে পূর্ণ কাহাকেও খোঁজে, আজও খোঁজে, বিশ্বাসীও খোঁজে, অবিশ্বাসীও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ওই আকাশপানেই চায়।

হরিলাল ফেটা-বাঁধা মাথাটাই দোলাইয়া কহিল কেয়া চাঁদ, ঘুঘু দেখা হ্যায়, লেকিন ফাঁদ দেখা নেই ; আব দেখো ফাঁদ সোনার চাঁদ।

গিরি কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, হরিলাল মরে নাই।

দুই

তারপর নবযুগের ন্যায়পর্ব্ব বা মামলা অধ্যায়।

এই পর্ব্বে উচ্ছ্বাস নাই, হাস্য-পরিহাস নাই, আছে শুধু হিমশীতল মস্তিষ্কের কূট কৌশল, চিন্তাকুল দৃষ্টি, আর একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য। আর আছে ন্যায়প্রার্থীর একটা উদ্বেগপূর্ণ উত্তেজনা, পরাজয়ে হ্রাস পায় না, জয়ে আশা মেটে না। আর দেখা যায় এখানে অর্থের শক্তি, বোঝা যায় বাক্য ব্রহ্ম—সে সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, সুসংলগ্ন দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিলেই এ পর্ব্বে জয়। শ্রীমন্ত মোক্তারের বাক্যের শক্তিতে তখনকার মত জামিনে খালাস হইয়া ফিরিল।

তারপর দিনের পর দিন পড়ে, সদরে উকীল মোক্তারের ঘটা বাড়ে, আর বাড়ীতে ঘড়া, ঘটী, তৈজসপত্র, গিরির গায়ের রূপা, কাঁসা, পিতল একে একে নিঃশেষ হইয়া যায়।

দিনের পর দিন শ্রীমন্ত বাড়ী ফিরিয়া আসে—একটা উদ্বেগপূর্ণ উত্তেজনা লইয়া। মামলায় জয় অনিবার্য্য, তবে খরচ করা চাই, আর সাক্ষী

তৈয়ারী করা চাই, উকীল বলিয়াছে,—এ নাকি ন্যায়ের বিধানে লেখা আছে। হায়রে ন্যায়! শ্রীমন্ত ওই কথা ভাবে, ঐ সে স্বপ্ন দেখে, তাহার কথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ওই বস্তুটুকুই আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্বিগ্না গিরি হাত পা ধুইবার জল দিয়া সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল আজ?

—দিন প'ড়ল, ফের পনর দিন পর।

—আবার দিন প'ড়ল! উদ্বেগে গিরি মরিয়া যাইতেছিল,—তার ত' ভবিষ্যৎ নাই, বর্ত্তমানও বুঝি অতলে তলাইয়া যায়।

শ্রীমন্ত কহিল,—আরে একি ভাতের গেরাস, যে মুখে তুল্লেই হয়ে গেল, বাস্। একটা একটা কথা ধরে এর জেরা কত, তকরার কত? আজ শালাদের সাক্ষী একটাকে, বুঝেছ, যা নাজেহাল করেছে উকীল, হা, হা, হা, বেটা কিন্তু সত্যি কথা বলেছিল। আমি তাকে শুধিয়েছিলাম রামদাস ঘোষের বাড়ীটা কোথা হে, শুধান আমার বটে। আমার উকীল ধরলে টুঁটী চেপে, তুমি নেশা কর? বেটার দুর্ম্মতি, বেটা বলে 'না'; অঃ—আমার উকীলের চোখ কি খর, বল্লে। দেখি তোমার হাত, হাঁ হাঁ বাঁ হাত, ব্যাস হাত পাততেই যায় কোথা, হাতের তেলো হলদে! অমনি ধরে শুঁকে বল্লে, এঃ এখনো গাঁজার গন্ধ বেরুচ্ছে, আর তুমি বলছ, না! দেখুন হুজুর দেখুন! আর বুঝলে কিনা কোর্টশুদ্ধ একেবারে কে কার গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাকিম মুখে রুমাল দিয়ে হাসে।

গিরির বোধ করি ভাল লাগে না, সে বুঝিতে পারে না ঐ ব্যক্তিটার গাঁজা খাওয়ার জন্ত স্বামীর অপরাধ লঘু হইল কেমন করিয়া, সে কহে—ভাত দিই খাও।

পা মুছিতে মুছিতে শ্রীমন্ত কহে—দাও।

খাইতে খাইতে শ্রীমন্ত আপন মনেই কহিল—কিচ্ছু হবে না, মামলায় কিছু নাই। আর ওদের সাক্ষীগুলো সব গোবর গুলছে। আর এক বেটাকে, বুঝেছ,—যে বেটা আমার সেই চাদরখানা, যেখানা ফেলে এসেছিলাম সেইখানা দেখে বল্লে, হ্যাঁ এই চাদর গায়ে দিয়ে আসামী ঘোষের বাড়ী এসেছিল, আমি দেখেছিলাম, আমার উকীল উঠেই তাকে ধরলে—তুমি কি খোঁড়া ?

—আজ্ঞে না—

—তবে তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন ?

—আজ্ঞে পা কেটেছে।

—কিসে, জুতোতে বুঝি ?

—সে আর কথা কয় না, উকীলও ছাড়ে না, জেরা কল্লে, নতুন জুতায় পা কেটেছে বুঝি ?

সে কথা কয় না, তখন উকীল কসে এক ধমক, তখন বলে—হ্যাঁ, আজই নতুন কিনেছি আমি।

উকীল বল্লে—হরিলাল দিয়েছে, না রাম ঘোষ ?

লোকটা যা হোক চালাক, বল্লে, আমার শ্বশুর দিয়েছে।

যাক্‌, শেষটা লোকটা সেরে নিয়েছে।

গিরির একটা ঘৃণা ধরিয়া যায়, ইহার কোথায় কৌতুক! আস্ফালনের ইহাতে কি আছে তাহার সরল নারী-মন খুঁজিয়া পায় না। ইহাই ত শুধু নয়, ইহার পর আরও আছে অর্থের ব্যবস্থা। সম্বল ত' আর কিছু নাই; শ্রী-গিরি বাকুড়ি বিকাইয়া গেছে, মহাজন সমগ্র জমিতে ক্রোক গাড়িয়া বসিয়া আছে, ঘরের তৈজস গেছে। আছে পরের অনুগ্রহের উপর ধার বা দান! তাও লোকে দেয় না; আর আছে বঞ্চনা করিয়া লওয়া বা লইয়া বঞ্চনা করা।

সাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে যাহা চুরি বা পরস্ব আত্মসাতের প্রবৃত্তি।

ওটা বোধ করি দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের মনে থাকে; নতুবা মানুষের আশ মেটে না কেন? মানুষ ত' বোঝে, অপরের না লইলে তাহার ভাগ মোটা হইবে না, তবু লালসা তাহার বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? এই লালসাই,—চুরিই বল, আর পরস্ব আত্মসাতই বল, সমস্ত প্রবৃত্তিগুলার উপাদান। লালসা যার আছে, ঐ ইচ্ছাও তার আছে। তবে শিক্ষায়, সংযমে, স্বচ্ছলতায় মানুষ তাহার উপর একটা কঠিন আবরণ রচনা করিয়া ওগুলাকে সমাধিস্থ করিয়া রাখে। কিন্তু লালসার সঙ্গে ক্ষুধার আগুন যেদিন প্রচণ্ড রূপে জ্বলিতে আরম্ভ করে, সেদিন অধিকাংশ লোকেরই সে অগ্নিশিখায় ঐ আবরণ একদিক হইতে ছাই হইতে থাকে আর প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে। তাই অভাবে স্বভাব নষ্ট, তাই দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

তাহার উপর পূর্ব্ব-পুরুষের প্রকৃতির ধারা নাকি রক্তের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। শ্রীমন্তের বাপের এ প্রবৃত্তি ছিল, হরিলালের গুরুগিরিতে ছেলেকে দিয়াছিল এই বিদ্যা খানিকটা শিখিতে, এই প্রবৃত্তিরই তাড়নায়। তখন শ্রীমন্ত যাহা পারে নাই, পারিল আজ, চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া দুনিয়া তাহাকে এ বিদ্যা বেশ ভাল করিয়াই শিখাইল, চর্চ্চায় চর্চ্চায় কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীমন্ত বাপ গুরুর উপরে চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু প্রথম যেদিন সে প্রতিশ্রুতি দিয়া বঞ্চনা করিয়া আসে, সে দিন সে সত্যকার হাসিমুখে পারে নাই। তবু ঠোঁটে হাসি মাখিতে হইয়াছিল। কেমন করিয়া যে সে হাসি আসিয়াছিল তাও সে জানে না, আর কেমন যে সে হাসির রূপ তাও সে কল্পনা করিতে পারে না।

বিপিন শ্রীমন্তের প্রতিবেশী, বাল্যসাথী, একসঙ্গে হরিলালের আড্ডায়

গাঁজা খাইতে শিখিয়াছিল। মামলার দিন শ্রীমন্ত তাহাকে গিয়া ধরিল—বিপিন দাদা, আজ ভাই আমাকে রাখতেই হইবে, দশটী টাকা আজ দিতেই হবে।

বিপিন কহিল—তাই ত শ্রীমন্ত, আমার কাছে ত নাই।

শ্রীমন্ত বিপিনের পা তুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দোহাই দাদা!

ভগবানের কৃপায় বিপিনের স্বচ্ছলতা ছিল বেশ, লোকটাও ছিল মন্দ নয়, সে বাল্যসাথীর এই পায়ে ধরা উপেক্ষা করিতে পারিল না, দশটা টাকা সে শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল—দেখিস্ ভাই।

শ্রীমন্ত তাহাকে অধিক কথা কহিতে দিল না, তাহার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তাহার সকৃতজ্ঞ বক্তৃতায় বিপিনের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। আপনি কোথা হইতে কথা আসিয়া জুটিয়াও গেল জিহ্বায়—দেখো তুমি দাদা, এই দিন চার পাঁচ, পাঁচদিনের বেশী হয়ত তুমি আমাকে ব'লো, আর এক মাঘে ত শীত পালায় না দাদা। না দিই ত জুতো মেরো তুমি রাস্তায় ধরে, ব'লো তোর জাতের ঠিক নাই।

প্রতিশ্রুতি পালন করিবার অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। কিন্তু গরীবের ইচ্ছায় সংসার চলে না, পাঁচ দিনের দিন বহু চেষ্টাতেও কোথাও কিছু মিলিল না।

সে সন্ধ্যায় বিপিন আর আসিল না, শ্রীমন্ত হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। পরদিন ভোরে শ্রীমন্তের মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতে বিপিনের সহিত দেখা হইয়া গেল। লজ্জিত শ্রীমন্ত অতি-লজ্জা পাইবার আশঙ্কায় বিপিন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আবার মিথ্যা কথা কহিয়া বসিল—এই যে দাদা, কাল ফিরতে বড় রাত হ'য়ে গেল—হেঁঃ—হেঁঃ—বলিয়া দাঁত মেলিয়া দিল।

হাঁসির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘামিতেছিল।

বিপিন ভদ্রতা করিয়া কহিল—তা বেশ, তা বেশ।

কয় পা আসিয়া তবে শ্রীমন্তের বুকের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিল। সেদিনও বিপিন আর আসিল না; পরদিন সন্ধ্যায় বিপিন নিজে আসিয়া শ্রীমন্তের দরজায় হাঁক দিল—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত! শ্রীমন্ত ঘরের মাঝে লুকাইয়া বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না।

গিরি কহিল, সাড়া দাও না—

শ্রীমন্তের মাথার বোধ করি ঠিক ছিল না, সে ঝাঁঝিয়া উঠিল—টাকা দিবি তুই? সাড়া দাও না, এ্যাঁ!

গিরি ব্যথিত বিস্ময়ে স্বামীর পানে তাকাইয়া দেখিল।

অন্ধকারে গৃহকোণে বসিয়া শ্রীমন্ত কি ভাবিতেছিল কে জানে। কিন্তু চোখ দুইটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল; বোধ হয় তীব্র দৃষ্টি হানিয়া ধরণীর বক্ষ ভেদিয়া সে খুঁজিতেছিল, কোথায় ধনরত্ন লুকান আছে! আঃ, কাল যদি সে মাটি খুঁড়িয়া টাকা পায়;—লাখ লাখ টাকা,—রাশি রাশি ধন, আঃ! দরিদ্রের বুভুক্ষা এমনি উদগ্র আর এমনি অক্ষয়ই বটে!

এগার

ইহার পর হইতে সে বিপিনকে এড়াইয়া চলিতে সুরু করিল, শুধু বিপিনকে কেন, গ্রামের প্রায় সকলকেই এড়াইয়া চলিতে হইল।

কারণ, প্রবৃত্তির মুখের সংযম বা সঙ্কোচের বাঁধ একবার ভাঙিলে ত আর রক্ষা নাই, মানুষ তখন আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। শ্রীমন্ত একে একে সকলেরই কাছে এমনি করিয়া হাত পাতিল, কাহারও কাছে দুটো টাকা, একটা টাকা, কাহারও কাছে বা একটা সিকি, পাঁচসের চাল—এমনি করিয়া ক্ষুদ্রতারও আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

গিরির লাঞ্ছনারও অন্ত নাই। শ্রীমন্ত ত বাড়ী হইতে পলাইয়া বাঁচে, কিন্তু বন্দিনী নারী ঘরে বসিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাগাদার কটু-বাণী নীরবে সহিয়া যায়, আবার শূন্য হস্তে পরের দুয়ারে দুই মুঠা চালের জন্য যাইতে হয়। অন্তরের দাহ অন্তরে লুকাইয়া কপট তোষামোদের হাসি মুখে মাখিয়া যখন গিরি পরের কাছে হাত পাতে তখন ভাবে, হায়, এত অপমান সে সয় কি করিয়া? সে যেমন হইয়াছে, সত্যই কি মানুষ এমন হইতে পারে?

শুধু তাহার সান্ত্বনা মেলে যখন সে মনোমন্দিরে আপনার একান্ত কামনার শিশু-দেবতাটীকে অর্চ্চনা করে। এখনও সে আশা ছাড়ে নাই, এখনও তাহার আশা, তাহার সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া বুক জুড়িয়া সে আসিবে, সেই তাহার ভবিষ্যতের ভরসা—সেই তাহার দুঃখ ঘুচাইবে,—আত্ম-ভোলা নির্জ্জন মুহূর্ত্তে আশা বিভোরা নারী-কণ্ঠ গুন গুন করিয়া গুঞ্জনও করিয়া উঠে—

এই যে আমার ভাঙ্গা বাড়ী, এই আ-গাছার বন,
আমার সোণার যাদু এসে হেথা রচবে সিংহাসন!

আত্মস্থ হইয়া যদি কখনও এ গান তাহার নিজের কানেই প্রবেশ করিত, তবে হয়ত নিজেই সে বিদ্রূপের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিত না।

এমনি করিয়াই দিন যায়।

শ্রীমন্ত খাবার সময় চুপি চুপি আসিয়া ঢুকে, খাইয়া দাইয়া আবার সরিয়া পড়ে, সে আড্ডা গাড়িয়াছে গিয়া বাগ্দীপাড়ায়।

দারিদ্র্যের লজ্জায় সমাজ-বিচ্যুতের মত সে ওদের দলে গিয়া ভিড়িল। এই মানুষগুলিকে শ্রীমন্তের লাগিয়াছিলও ভাল,—ওরা লজ্জা দেয় না,

লজ্জা পায় না, ধার লওয়াই ওদের স্বভাব, শোধ দেওয়া অভ্যাস নাই, সেটাও স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তুমি পাইবে পাইবে,—তাহার জন্য গালি দাও সে সহ্য করিবার শক্তি ওদের আছে। শুধু সহ্য করা নয়, হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে পারে, নির্য্যাতন—তাও সহ্য করিতে পারে। শ্রীমন্তের মনে হইত এরাই বুঝি সত্য দারিদ্র্যকে ভালবাসে। সে ইহাদেরই মধ্যে গিয়া ইহাদের পানে চাহিয়া থাকিত, অন্তরে অন্তরে কিন্তু সে দরিদ্রকে ঘৃণা করিত। সে দারিদ্র্যকে ভালবাসিতে পারে নাই—সে ভাবিত ইহারাও যদি তাহার মত দারিদ্র্যকে ঘৃণা করিত, তবে সে ইহাদের রাজা হইয়া বসিয়া থাকিত!

সেদিন শ্রীমন্ত খাইবার জন্য সবে চুপে চুপে গিয়া বাড়ীতে পা দিয়াছে, এমন সময় এ দুয়ার হইতে বিপিন হাঁকিল—শ্রীমন্ত,—শ্রীমন্ত—!

শ্রীমন্তের অঙ্গ হিম হইয়া গেল, ঘরের দুয়ারে তালা বন্ধ, ঘরে ঢুকিয়া যে খিল দিবে তাহার উপায় নাই,—সমস্ত কাপুরুষ ক্রোধ গিয়া পড়িল তাহার গিরির উপর, সে থাকিলে ত এ অবস্থায় তাহাকে পড়িতে হইত না!

রোজ রোজ তাহার ষষ্ঠীতলা যাওয়া আজ ঘুচাইতে হইবে, ছেলের অভাবে ত রাজ্য-পাট ভাসিয়া গেল,—তাই রাজকুমারের কামনায় রাণীর ষষ্ঠীতলায় পূজা,—গলায় বোঝাখানেক মাদুলী—!

কথাটার মধ্যে আবার একটু স্বপ্ন-কল্পনার খেলা ছিল :—

পূজার সামর্থ্য গিরির ছিল না, রাস্তায় বাহির হইবার মত প্রকৃতি বা সাহসও ছিল না, সে মনোমন্দিরেই শিশু-দেবতার অর্চ্চনা করিত আর ওই গলায় ধারণ-করা মাদুলীগুলির ধোয়া জল খাইয়াই ব্রত পালন করিত।

কিন্তু নারী-বক্ষে যে উগ্র গোপন ক্ষুধা অহরহঃ জাগে, সারা মস্তিষ্কে সে

ক্ষুধাতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা নিত্য কত আকাশ-কুসুম রচনা করে। সেই কথন তন্দ্রাঘোরে বঞ্চিতা নারীটীর সহিত পরিহাস করিয়া গিয়াছিল।

সেদিন গিরি স্বপ্ন দেখিয়াছে—সে যেন ষষ্ঠীতলা পূজা করিতে গিয়াছে, কোথা হইতে একটী দামাল শিশু, মুখে অজস্র লালা গড়াইয়াছে, গায়ে ধুলা—হামা দিয়া আসিয়া ওর আঁচল ধরিয়া খিল্ খিল্ হাসিয়া কহিল—মা—ম্ - মা—ম্। গিরি ব্যাকুল আগ্রহে হাত পাতিয়া তাহাকে ডাকিল—

ছেলেটীর সে কি খল্‌খল্ হাসি!—খল্‌খল্ হাসিয়া সেও বাহু বাড়াইয়া গিরির বুকে ধরা দিল। তাহাকে বুকে ধরিতেই গিরির বুক যেন জুড়াইয়া গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙিয়া গিরি দেখে শূন্য শয্যায় সে মাথার বালিশটীকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সেই অবধি সে নিত্য ষষ্ঠীতলা যায়। নিজের হাতে পোঁতা রক্তকরবী গাছটীর ফুল, কাজল-দীঘির একটু জল, দুটীখানি আতপ চাল—তার উপর এক ফোঁটা গুড় হইল পূজার সামগ্রী! চাল কয়টী সে বামুন-বাড়ীতে সংগ্রহ করিয়াছে;—পোয়াখানেক আতপচাল, তাহাতেই আজও চলিয়াছে, আর খানিকটা গুড় তাও ভিক্ষায় লব্ধ।

গিরি সেই ষষ্ঠীতলা গিয়াছিল।

কিন্তু উত্তর না পাইয়া বিপিন আজ ফিরিয়া গেল না, সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্তকে দেখিয়া ফেলিল, কহিল—এই যে, আচ্ছা জুয়োচ্চোর ত রে তুই শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত উত্তর দিতে পারিল না। আর কি-ই বা উত্তর দিবে?

বিপিনের জিহ্বা দিয়া যে কটু বিষ ঝরিল, বিষধরেরও বোধ করি তত বিষ সঞ্চিত থাকে না।

সে কহিল—কথা ক'স্ না যে?

শ্রীমন্তের নীরব সহিষ্ণুতাও তাহার সহ্য হইতেছিল না।

শ্রীমন্ত অতি কষ্টে কহিল—কি আর বল্‌ব দাদা—

—টাকা দিবি কিনা ?

—দোব।

—দে, তবে দে, এখুনি দে।

—এখুনি কোথায় পাব ?

বিপিন কহিল—কোথায় পাবি তা আমি কি জানি রে শালা—ঘটী বাটী বেচ্, না থাকে পরিবার বাঁধা দে—

এক মুহূর্ত্তে শ্রীমন্তের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মানুষ একেবারে মরিয়া যায় না। ইজ্জতের উপর ঘা পড়িলে মানুষের তা সয় না—এখানে সে মরিয়া হইয়া উঠে, এটা পশুরও আছে—শ্রীমন্ত ত' মানুষ! নত মাথাটা শ্রীমন্তের খাড়া হইয়া উঠিল, দেহের শক্তির দম্ভে যে হাঁক সে দিল তাহাতেই বিপিনের হইয়া গেল! শ্রীমন্তের দেহের শক্তির কথাও তাহার না-জানা নয়। তাহার পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ চোখ কেমন হইয়া গেল। বেচারী এক পা, এক পা করিয়া পিছাইয়া কোন ক্রমে শ্রীমন্তের দরজাটা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াই আপন ঘরমুখে দৌড় মারিল। আপন বাড়ীর দুয়ারে গিয়া তবে সে পিছন ফিরিয়া দেখিল, শ্রীমন্ত কত দূরে ?

সেই খানেই দাঁত-মুখ খিচাইয়া কি কতকগুলা বলিয়া তবে সে ঘর ঢুকিল।

শ্রীমন্তের আজ আর হাসি আসিল না,—ক্রোধে সে ফুলিতেছিল। কিন্তু তবুও মনটা কেমন করিতেছিল। সামান্য খানিকটা অস্বস্তি,—বিপিন যদি আবার নালিশ করে!—বসিয়া থাকিতে থাকিতেই আবার একটা পরিবর্ত্তন দরিদ্রের মনে ঘটিয়া যায়।—শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে বিপিনের

দুয়ারে গিয়া উঠিল, সেই নত ভঙ্গী, বিনীত ভাব। যেন শৃঙ্খলিত একটা পশু আত্মবিস্মৃত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শৃঙ্খলের নির্ম্মম নিস্পেষণে স্নায়ু, তন্ত্রী, অস্থি, চর্ম্ম, মাংস টন্ টন্ করিয়া উঠায় দারুণ যাতনায় কুণ্ডলী পাকাইয়া আবার পদলেহন করিতে জিভ বাহির করিয়া হা হা করিতেছে।

বিপিনের দুয়ারে গিয়া বিনীত কণ্ঠে সে হাঁকিল, বিপিন দাদা, বিপিন দাদা—

বিপিন বন্ধ ঘরের খোলা জানালাটা দিয়া শাসাইল, কাল ফৌজদারীতে নালিশ করব আমি, চিটিং কেস—

শ্রীমন্ত কাকুতিতে কদর্য্য তোষামোদের হাসি হাসিয়া কহিল, রাগ করোনা দাদা, তুমি রাগ করলে, পায়ে ধরচি দাদা।

বিপিন চুপ করিয়া থাকে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের দুর্দ্দান্ত শত্রুর পদলেহন মন্দ ঠেকেনা, বেশ মুখরোচকই বোধ হয়।

বিপিনের নীরবতায় শ্রীমন্ত সাহস পাইয়া একটু মুখর হইয়া উঠে, অনর্গল চাটুবাক্য উদ্গার করিয়া যায়। বিপিনও আর প্রসন্ন না হইয়া পারেনা, সে দরজাটা খুলিয়া কহিল—আয় ভেতরে এসে বোস, অনেকদিন একসঙ্গে খাই নাই, চান করবার আগে—নে একবার তৈরী কর।

সে গাঁজার সরঞ্জাম পাড়িয়া আনিল। শ্রীমন্ত গাঁজা টিপিতে টিপিতে বলিল, তোমাদের সেই লাল বলদটা মনে পড়ে বিপিন দা, ওঃ অমন বলদ কিন্তু গাঁয়ে কারু ছিলনা বাপু।

—তার চেয়েও ভাল বলদ করেছি আমি এখন, একটা সাদা আর একটা কাল।

শ্রীমন্ত কহিল, বটে বটে, সেদিন দেখলাম বটে মাঠে চরছিল, তা

ভাবলাম ভিন্‌গাঁয়ের কারও, তা সে গরু তোমার? এ তল্লাটে অমনটি কারও নেই।

বিপিন গাঁজা খাইতে খাইতে কহিল, তুই আসিস না কেন? এত খেতেই হয়, আমার কাছে এলেই হয়।

শ্রীমন্ত কেমন করিয়া বিপিনকে আপ্যায়িত করিবে খুঁজিয়াই পায় না, শেষে কহে, আচ্ছা তুমি আমার বাড়ী ঢোক না কেন? বার থেকেই ছি-মন্তে বলে চলে এস। বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি চ'লে গিয়েছ। ও—বৌ বুঝি বেরোয় না? বৌটা ভারী পাজী। দাদা বল্লেই বুঝি দাদা হয়? বন্ধুলোক তুমি,—যেয়োত তুমি,—কেমন না বেরোয় দেখব আমি। বলে—গাঁসুবাদে মুচীমিন্সে মামা; যেয়োত, যেয়োত দাদা আমার দিব্যি।

শ্রীমন্ত চলিয়া যাইতেছিল, বিপিন কহিল—ওরে শ্রীমন্ত দাঁড়া। একটা লাউ নিয়ে যা, মেলা লাউ হয়েছে আমার।

শ্রীমন্ত দাঁড়াইয়া বিপিনের সুন্দর পরিপাটী ঘর-দুয়ারের পানে চাহিয়া দেখে। চারিদিকে শ্রী যেন ঝলমল করিতেছে। এদিকে কয়টা ধানের গোলা। ওদিকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী শান্তদৃষ্টি কয়টা গাভী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক! শ্রীমন্তের বুক দিয়া একটা হিংসা-কাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়ে! বিপিন তাহাকে শুধু একটা লাউ নয় আরও কতকগুলা তরকারী দিল।

যাইতে যাইতে আবার নিজে ফিরিয়া শ্রীমন্ত কহিল—বলতে লজ্জা হচ্ছে দাদা, আট আনা পয়সা দিতে যদি আর শলিখানেক চাল—

বিপিন কহিল—বোস্।

শ্রীমন্ত বসিল। একাকী বসিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—বিপিনকে সে খুন করিয়া ফেলে।

ঘরে ফিরিয়া শ্রীমন্ত পয়সা চাল তরকারী নাড়িতে নাড়িতে বেশ মৃদু মৃদু হাসিল,—ক্রূর, নিষ্ঠুর, হিম-শীতল হাসি। বোধ করি অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল বিপিনকে বঞ্চনা করিয়াই এ হাসিটুকুও পাইয়াছে; ইহারই মধ্যে দরিদ্র শ্রীমন্ত ধনীকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে, ধনকে ভালবাসিয়াছে।

এই সময় ও দরজা দিয়া প্রবেশ করিল গিরি। গিরির উপর তখন আর তার ক্রোধ ছিলনা; তাহার চকিত দৃষ্টি গিয়া পড়িয়াছিল আপন শ্রীহীন ঘরের উপর। ঘরখানায় মূর্ত্তিমন্ত দৈন্য যেন বাসা গাড়িয়াছে; সর্ব্ব অঙ্গ তাহার ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। সুখহীন—কদর্য্য—কুশ্রী—সব!

গিরি ঘরে ঢুকিয়াই স্বামীকে দেখিয়া কহিল—পুরুষ জাতের মুখে ঝাঁটা, ঘেন্না ধরে গেল, টাকার জন্যে এরা না পারে কি, মা গো মা!

শ্রীমন্ত কোন উত্তর করিল না, শুধু গিরির মুখপানে চাহিয়া—আপনার জীবনের বঞ্চনার কথাই ভাবিতেছিল।

গিরি বলিয়াই গেল,—শুধু আমাদের হরিলালের দোষ কি, ওপাড়ার হরিশ পাল গো, গিয়েছিলাম ষষ্ঠীতলা, শুনে এলাম মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে একজনা কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে তার সঙ্গে, টাকা পাবে নাকি অনেক।

শ্রীমন্ত চকিত হইয়া কহিল—কত টাকা পাচ্ছে?

—আড়াই শো টাকা।

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গিরি কহিল—কলির চারপো পূরো হ'ল। বলিয়া ষষ্ঠীর প্রসাদ একটী আতপকণা তুলিতে ব্যস্ত হইল।

সহসা শ্রীমন্ত কটুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—যেমন কপাল আমার বিয়ে করলাম তা বাঁজা, একটা মেয়ে থাকলে ত আজ এ আড়াই শো টাকা ঘরে আসত।

গিন্নির নথের কোণে তোলা আতপকণাটী খসিয়া পড়িয়া গেল।

সে বজ্রাহতার মত স্বামীর মুখপানে চাহিল,—দেখিল সহজ স্বাভাবিক মুখভঙ্গী স্বামীর, কোথাও এতটুকু একটা রেখার বিকৃতির মাঝে প্রচ্ছন্ন ব্যথার কোন রেশ নাই। অতি সরল ভাবেই সহজ কথাটী যেন সে কহিয়াছে।

খানিকটা গিন্নির কোন বাক্য সরিল না, দেহখানা নড়িল না, সে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাহার সম্বিত ফিরিয়া আসিল। সে কোন কথা না কহিয়া আপন গলার মাদুলীর গোছাটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ও সত্ত পূজা-করা ষষ্ঠীর কৌটাবাটা নির্ম্মাল্য, সব লইয়া খিড়কীর ঘাটে বাহির হইয়া গেল।

বার

এতখানি বিয়োগান্ত করিয়া যদি দুঃখী দুটী নর-নারীর জীবনের জমা-খরচের পাতার শেষে সেই অদৃশ্য হিসাবী দাঁড়ি টানিয়া হিসাবটা শেষ করিয়া দিতেন—তবে বোধ হয় ছিল ভাল। কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না।

গিন্নিকেও জীবনের জের টানিতে হইল, শ্রীমন্তকেও।

শ্রীমন্ত খাইয়া দাইয়া সন্ধ্যায় ভাবিতেছিল মামলার কথা। কাল মামলার শেষ দিন। বিপিন আসিয়া ডাকিল, শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, এস, এস,—দাদা এস।

বিপিন আসিল, হাতে এক ঠোঙা খাবার!

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে চক্ষুর অগোচরে একটা ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল দ্বিপ্রহরে। গিন্নি যখন ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা

লইয়া খিড়কীর ঘাটে গেল। খিড়কীর পুকুরটী একটী ছোট এঁদো ডোবা; ওখানে বাসনই মাজাই হয়, মেয়েরা স্নান কেহ বড় করে না। গিরি ঘাটে গিয়াই হাতের সেই ছেঁড়া মাদুলিগুলি আর ষষ্ঠীর কৌটা-বাটা মুহূর্ত্ত দ্বিধা না করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীমন্তের ওই কথার পর বোধ করি কোন জননীই এ ছাড়া আর কিছু করিতে পারিত না, গিরিও পারিল না।

কয় ফোঁটা জলও চোখ দিয়া ওই ডোবার জলে ঝরিয়া পড়িল। গিরি হাত-পা ধুইয়া ফিরিতেছিল,—কিন্তু মনে হইল যদি দেবতার কোন প্রসাদ তাহার এই অভাগা অঙ্গে কোথাও আজ লাগিয়া থাকে, যদি তাহারই জন্ম কোন ভাগ্যহীন শিশু-দেবতাকে তাহার মন্দিরে আসিতে হয়,—আর এই কামনা, কামনা করিতে হয় যেমন স্নান করিয়া—ত্যাগও হয় ত করিতে হয় তেমনি স্নান করিয়া—। এমনি একটা বিপর্য্যস্ত বিহ্বল মন লইয়া সে ওই ডোবার জলে নামিয়া পড়িল। গায়ের কাপড় খানা পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিয়া সে স্নান করিয়া ফেলিল। ওই ক্লেদাক্ত জলে দেহটা সিক্ত করিয়া, সন্তান-বিয়োগের অশুচি অঙ্গে মাখিয়াই যেন সে ঘরে ফিরিল।

ডোবাটার চারিপাশে ঘন অতি নিবিড় বাঁশের বন। তাহারই ফাঁকে ফাঁকে সংকীর্ণ ঘাটগুলি জলে নামিয়াছে। ঘাটের গোড়ায় নামিলে বড় কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ধকার বাঁশের ঝাড়ের ফাঁক দিয়া ডোবাটার মধ্যস্থল বেশ দেখা যায়। শ্রীমন্তের ঘাটের পাশেই বিপিনের ঘাট; বিপিন নামিয়াছিল ঘাটে। অগভীর জলের জন্ম গিরিকে ডোবাটার প্রায় মধ্যস্থলে পর্য্যন্ত নামিতে হইয়াছিল, মধ্যজলে আত্মহারা গিরি অটুট যৌবন-সম্ভার মুক্ত করিয়া তখন সেই মুক্তি-কামনায় পঙ্কস্নান করিতেছিল।

বিপিনের চোখে পড়িল সেই রূপ! এলানো দীর্ঘ কেশভার, মাজা রংএ নিটোল পরিপূর্ণ যৌবন, সুসন্নিবিষ্ট সুদৃঢ় প্রতি অঙ্গ,—পুরুষকে চঞ্চল করিবার মত বটে। বিপিন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বাকী বেলাটায় আসিবার জন্য সে দশবার পথে নামিয়াছে, দশবার ফিরিয়াছে।—আসিলে শ্রীমন্ত কিছু মনে করিত না; কিন্তু দুর্ব্বল মন বলিয়া বিপিনের কেবলই মনে হইয়াছে, শ্রীমন্ত ধরিয়া ফেলিবে হয় তো। অবশেষে সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্তের নিমন্ত্রণ আশ্রয় করিয়াই সে আসিল, আসিতে আসিতে আবার ফিরিয়া এই খাবার কিনিয়া আনিল। সে খাইলেও বিপিনের তৃপ্তি, শ্রীমন্ত যা খাওয়ায় সে ত জানে, হয়ত সব দিন দুই বেলা খাইতেই পায় না।

ঠোঙাটা শ্রীমন্তের হাতে দিয়া কহিল—নে—নিয়ে এলাম।

শ্রীমন্তও বিস্মিত হইয়া গেল, সে কহিল, খাবার?

কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন, বিশেষ ওই উগ্র পশুটার বিবরে বসিয়া।

বিপিন একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, মাল খেয়ে খাব;—নে রাখ্ না।

শ্রীমন্ত পাশেই ঠোঙাটা রাখিয়া দিল। বিপিন চটিয়া গেল, হতভাগা রাক্ষস সত্যই হয় ত সবই গিলিয়া ফেলিবে! সে কহিল—কিন্তু কি আবাগু রে তুই, সে-ই ছি-মন্ত এখনো আছিস্?—খাবারটা দিয়ে আয়, একটা বসবার কিছু নিয়ে আয়,—আলো আন, জমিয়ে বসা যাক একটু, না—কি? এই বুঝি তোর আসতে বলা!

শ্রীমন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল, বিশ্বের পরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা দিন দিন সে হারাইয়া ফেরিতেছিল—কিন্তু আজ বাল্যসাথীর এ ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া সে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া খাবারের ঠোঙাটা লইয়া গিরিকে ডাকিল—রাখত। বাল্যকালের বন্ধু। হাজার হোক,—দেখছ ত,—

গিরি উনানে আগুন দিতেছিল, মন ভাল ছিল না। সারাক্ষণ বুকের ভিতর বিসর্জ্জনের বৈরাগী সুর বাজিতেছিল। কিন্তু ঘরে আজ বিপিনের দেওয়া চাল ছিল, তরকারী ছিল; আর তাছাড়া তাহার মনের অবস্থায় মানুষ কিছুই প্রত্যাখ্যান করে না, কোন কিছু অমান্যও করে না। এ অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দিয়াও প্রত্যেক কার্য্যটী নীরবে করিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এটা বোধ হয় অভিমান, শীতল অভিমান।

গিরি বিনা বাক্যব্যয়ে ঠোঙাটী হাতে লইয়া কহিল, কি করব?

—দুটো কিছুতে কতক সাজিয়ে দাও—আর দুটো গেলাসে, গেলাস বুঝি মোটে একটা আছে—তা ঘটিতে করে জল আর গেলাসটা ধুয়ে দাও,—কতক গুলো রেখে দাও।

শেষ কথাটা সে চাপিয়া বলিল।

ওদিক হইতে বিপিন কহিল, আমাকে ভাই অতি অল্প দিও—গুণে দুটী—অম্বলে মরে যাচ্ছি · খবরদার দুটীর বেশী নয়।

শ্রীমন্ত বলে, তবে এক কাজ কর, অল্প অল্প দুটো জায়গায় দিয়ে বাকী রেখে দাও। আর এক কাজ কর দেখি, একটু জল চড়িয়ে দাও, —চা হোক, বিপিন দা—চা খাবে ত চা?

বিপিন কহিল, তা মন্দ কি—

শ্রীমন্ত বলিল—তুমি জল চড়িয়ে দাও আমি চা আনি।

—হ্যাঁ একটা কিছু দাও দেখি বসতে, -ঐ চট-টা,—তাই বেশ হবে। একটা আলো—আলো বুঝি আর নাই,—তাইত,—তা ওইটাই দাও।

আলোটা নামাইয়া চটটা পাড়িয়া শ্রীমন্ত কহিল, তুমি দুমিনিট বস ভাই, মালটাল বের কর, আমি চা আর চিনি নিয়ে আসি।

বিপিন আপত্তি করিল না, এমন নির্জ্জন মুহূর্ত্ত তাহার অন্তরও কামনা করিতেছিল—যদি একটা কথা কহিবার সুযোগ পাওয়া যায়!

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল, বিপিন গাঁজা বাহির করিতে পকেটে হাত দিয়াই ভাবিতে লাগিল—একটী কথা, কি একটী কথা যা ঐ সুন্দরীর মনস্তুষ্টি করিয়া শোভন ভাবে কওয়া যায়।

গিরি উনান জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিল। আলো ছিল না, ঐ উনানের বহ্নি-শিখাতেই গিরির মুখের একপাশ দেখা যাইতেছিল, ব্যথিত ম্লান দৃষ্টি, চুল তখনও এলানো, কয়টা চুলের গোছা কপালের উপর পড়িয়াছে, সেগুলা ওই আগুনের শিখাতাড়নে তপ্ত বায়ু-প্রবাহে নাচিতেছিল।

বিপিন সহসা কহিল, আলোটা নিয়ে যাও, অসুবিধা হচ্ছে—কোন দরকার নাই আমাদের—নিয়ে যাও।

কিন্তু লইয়া কেহ গেল না। বিপিন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল—দেরী বেশী হয় নি আমার, আমি দৌড়ে এসেচি। কই মাল বের করনি এখনও ?

এই যে—বলিয়া বিপিন সব সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল।

শ্রীমন্ত চা চিনি দিয়া গিরিকে কহিল—চা কর।

চা করিতে করিতে অন্ধকারে খানিকটা চা নিজের হাতের উপর গিরি 'উঃ !' করিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত ধমক দিয়া কহিল, আচ্ছা অকম্মা তুমি, চা-টা ফেলে—উঃ! বলিয়া শেষটায় ভ্যাঙাইয়া উঠিল।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, হাত বোধ হয় পুড়ে গিয়েছে আহা! তুই একটা জানোয়ার রে ! একটু নারকেল তেল চূণের জলে কিংবা আলু বেঁটে—

শ্রীমন্ত কহিল, কিছু করতে হবে না দাদা, গরম চা মুখে সয় তা আর হাতে সইবে না ?

যাই হোক চা খাইয়া, গাঁজা টানিয়া, আড্ডা জমাইয়া বহু চেষ্টা করিয়া বিপিন উঠিল, কহিল,—তা হ'লে উঠি, কালকে মামলার দিন, নয়? আচ্ছা সন্ধ্যেয় এসে শুনব কি হয়।

বিপিন বাড়ীর বাহির হইয়াও চলিয়া গেল না; রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল। একটা কথা শোভনভাবে মনস্তুষ্টি করিয়া বলিতে পারে নাই সে; তখনও সে সেই কথাই ভাবিতেছিল।

গিরি তখন শ্রীমন্তকে কহিতেছিল, কালই কি মামলা শেষ হবে?

শ্রীমন্ত কহিল, হাঁ।

—কি হবে? বিপদের উদ্বেগে অভিমান কোথায় গেছে তাহার।

শ্রীমন্ত কহিল, কি হবে, সেত ভগবান জানেন, কিন্তু খরচ নাই। কাল যদি আর উকীল না দিতে পারি তবে যে সব মিছে।

—একবার ওকে বলে দেখলে না কেন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীমন্ত কহিল—তা হ'তো।

বাহিরে বিপিনের মন নাচিয়া উঠিল, গিরির মনস্তুষ্টি সে করিতে পারে, সে পুনরায় হাঁকিল, শ্রীমন্ত!

—কে, দাদা?

—হ্যাঁ রে, ফিরে এলাম আবার, একটা কথা শুধোব, কিছু মনে করিস্ না ভাই, কাল মামলার খরচপাতি—

শ্রীমন্ত উচ্ছ্বাসভরে কহিল, কোথায় পাব ভাই?

—আচ্ছা কাল সকালে আমার কাছ হয়ে যাস্, বুঝলি, মামলা জিতে কিন্তু সন্দেশ আনতে হবে।

বিপিন হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

গিরি কহিল, বড় ভাল লোক বাপু।

বাহিরে বিপিনের বুকটা নাচিয়া উঠিল, সে সেই আনন্দটুকু সম্বল করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

শ্রীমন্ত খাইয়া উঠিলে গিরি সমস্ত সামলাইয়া ফেলিল। শ্রীমন্ত কহিল, তুমি খাবে না?

—না।

—ও—আজ বুঝি ষষ্ঠী পূজো করেছ, তা এক কাজ কর ওইত মেলা খাবার রয়েছে খাও।

গিরির চোখের জল আর বাঁধ মানিতেছিল না, সে মুখ ফিরাইয়া কোনরূপে কহিল, না।

শ্রীমন্ত গিরির হাত ধরিয়া কহিল—রাগ করেছ?

গিরি একবার হাতটা টানিয়া তারপর স্থির ভাবেই শ্রীমন্তের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। সে যে কি হাসি তাহা শ্রীমন্ত বুঝিল না, সে গিরির হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার মনে হইল এর চেয়ে গিরি কাঁদিলে ভাল হইত, সান্ত্বনা দিয়া অভিমানটা ভাঙান যাইত।

তের

পরদিন শ্রীমন্ত সদরে গেল, গিরি উদ্বেগ-রুদ্ধ বুকে বসিয়া রহিল। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে রহিল, খাওয়া হইল না, কিন্তু ক্ষুধা ছিল। আগের দিনটাও উপবাসে গিয়াছে, ক্ষুধা নির্ম্মম ভাবে পাকস্থলীতে পীড়ন করিতেছিল কিন্তু মুখে তাহার কিছু রুচিল না। এক ঘটী জল ঢক্ ঢক্ শব্দে মুখে ঢালিয়া পেটের আগুনে যেন সে জল দিতে চাহিল।

কিন্তু জলের বুকের মাঝেও যে আগুন জ্বলে! বুকের মাঝে অসুস্থতার চেয়েও অসুস্থ একটা অস্থিরতায় জীবন যেন তাহার কণ্ঠনালাতে ঠেলিয়া

উঠিয়া আসিয়াছে। হাত পা অনর্গল ঘামিয়া ঘামিয়া ঠাণ্ডা হিম হইয়া গিয়াছে; পেটের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে! একটা আশার কথা বলিবার কেহ নাই। পাড়ার লোকে, দিনের পর দিন পড়ায় শ্রীমন্তের মামলার দিনের হিসাব রাখা ছাড়িয়াই দিয়াছিল। তাহারা মামলা অন্তে শ্রীমন্তের মুখে জয়-বার্ত্তা বা গিরির করুণ আর্ত্তনাদে তাহার বন্ধন-দশার কথা জানিবার প্রত্যাশায় ছিল।

আসিল একজন—সে বিপিন। বেলা দুই প্রহরের সময় সে 'শ্রীমন্ত' বলিয়া একেবারে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। গিরি খুঁটীতে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল,—অঙ্গ-বাস খানি বেশ ভাল ভাবেই জড়ান ছিল কিন্তু মুখ অনবগুণ্ঠিত।—বিপিনকে দেখিয়া সে নড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না,—অনাহারে দুর্ব্বলতায়, না মনের পঙ্গুত্বের জন্য কে জানে।

বিপিনেরই লজ্জা হইল, সে আসিয়াছিল শ্রীমন্ত নাই জানিয়াই, আর এমনি অতর্কিত মুহূর্ত্তে হয়ত গিরির একটা অসম্বৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে আশা করিয়াই। কিন্তু তাহার কল্পনায় ছিল—গিরি তাহাকে দেখিয়া আপন অসম্বৃত অবস্থা সংযত সম্বৃত করিতে বেশ একটু সলজ্জ চঞ্চল হইয়া উঠিবে, হয়তো বা একটু খানি জিভ কাটিয়া ফেলিবে, আর সেই সুসংবদ্ধ ছোট ছোট দাঁত গুলির শ্রেণী বহিয়া ঠোঁটের কোণ দুটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা লজ্জার হাসির রেখাও চকিতের মধ্যে চপলার মত মত দেখা যাইবে। কিন্তু কিছুই গেল না—গেল শুধু তাহার অসম্বৃত অবস্থাই দেখা, সে অবস্থা অচঞ্চল, তাহার মধ্যে একটা পীড়িত ভাব, সে ভাবে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না।

বিপিন চলিয়া গেল।

আবার ঘণ্টা দুই পরে। এবার সে বেশ করিয়া সাড়া দিয়া আসিল,

গিরি যাহাতে চকিত হইয়া উঠে। কিন্তু এবারও দেখিল সেই ভাবে গিরি বসিয়া। বিপিন অবাক হইয়া গেল, পরক্ষণেই মনে হইল, সত্যই অসুস্থ নয় ত? কিন্তু অসুস্থ হইলেও নারী লজ্জায় সংজ্ঞা হারায় না। চেতনা আছে ত? বিপিন ওদিকের দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া আসিল, বার দুই গলাটা পরিষ্কার করিবার ভাণে বেশ জোর সাড়া দিল, —কিন্তু গিরি সেই বসিয়াই থাকিল।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা তন্ময় অবস্থা গিরির আসিয়াছিল, সকল মানুষেরই আসে, উপবাসের দুর্বলতা,—মনের দুঃখের গভীরতায় অবসাদগ্রস্ত চিত্ত কোন একটা কিছু আশ্রয় করিতে পারিলেই সেইটা লইয়াই তন্ময় হইতে হইতে হইতে অমনি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে। তন্ময়তাও নিদ্রার মত বস্তু; তন্ময়তায় সকল চিন্তা, সকল অস্থিরতা লুপ্ত হইয়া যায়। মন চলিয়া যায় ধ্যানের বস্তুর পানে,—বাস্তব জগত হইতে দূরে। ঠিক নিদ্রারই মত।

বিপিন নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—তবুও সেই অবস্থা।

এবার বিপিনের ভয় হইল। সে চোখের পানে চাহিয়া দেখিল— গিরি চোখ চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছু দেখিতেছে না। বিপিনের পা দুইটা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড চলিতেছিল অসম্ভব জোরে।

সে হাঁটুর উপর দুটী হাত দিয়া হেঁট হইয়া একটু দূর হইতে ভাল করিয়া গিরির চোখের দৃষ্টির অবস্থা পরীক্ষা করিতে চাহিল; ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা হনুমান বিপুল শব্দে ঘর খানার মাথায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওই বিপুল শব্দটা ধ্যানস্থার সুদূরগত মনকে যেন ডাকিয়া ফিরাইল। গিরি চমকিয়া উঠিল; এবং ঐ অবস্থায় বিপিনকে দেখিয়া, পায়ের গোড়ায় সাপ দেখিলে লোকে যেমন চমকিয়া পিছাইয়া যায় তেমনি

ভাবেই– পিছাইয়া গিয়া বারান্দার এককোণে বিস্ফারিত নেত্রে বিপিনের পানে চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

এমন অবস্থায় যে কেহ আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হয়তো বলিয়া উঠিত, আঃ বাঁচলাম!

কিন্তু বিপিন কিছুতেই তাহা পারিল না,—সে ত্রস্ত পদে পলাইয়া গিয়া যেন বাঁচিল। তারপর বিপিন বাড়ীতে আসিয়া দাওয়াতে বসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিল, হায় করিলাম কি, মনের পাপেই মরিলাম! —শ্রীমন্ত আসিলেই তো গিরি বলিয়া দিবে।—বিপিনের বুকখানা গুম্ গুম্ করিয়া উঠিল–দুর্দ্দান্ত শ্রীমন্ত সেদিন একটা কথাতেই খুন করিতে উঠিয়াছিল,—আজ! তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, বেচারী বিনা কাজে অবেলায় মাঠপানে চলিল।

মাঠে মাঠে ঘুরিয়া নদীর ধারে এক স্থানে বসিয়া একবার গাঁজা খাইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আপন দাওয়াতে পা দিয়াই শুনিল শ্রীমন্তের বাড়ীতে কতকগুলি লোকের গলা শুনা যাইতেছে। বিপিনের কিঞ্চিৎ সুস্থ প্রাণ আবার কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল; তবে ত শ্রীমন্ত ফিরিয়া গিরির মুখে সব শুনিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছে, আর লোকজনে বোধ হয় শান্ত করিতেছে।—হ্যাঁ শান্ত করিতেছে, না তাহার মাথা খাইতেছে, বোধ হয় তাহারই বিরুদ্ধে চুকলামী করিয়া জানোয়ারটাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতেছে।

সে ধীরে ধীরে মৃদু পদক্ষেপে আপন গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য সবে পা উঠাইয়াছে, এমন সময় রাস্তা হইতে কে কহিল—এই যে, বিপিন না—?

—কে? বিপিন অকারণে অসম্ভব রকম চমকিয়া উঠিল, লোকটা এত গ্রাহ্য করিল না, সে কহিল, শুনেছ?

বিপিনের শঙ্কা বাড়িয়া গেল, সে অসম্ভব রকমের বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল—ও সব শুনাশুনি কি ? যত সব মিছে—

লোকটা কহিল, মিছে কি রকম ? আমি শ্রীমন্তের বাড়ীতে শুনলাম—। বিপিন খিঁচাইয়া উঠিল—শুন্‌লে তা কি হবে কি ? তাই বিশ্বাস করে বসে থাক—

লোকটা বিস্মিত হইয়া কহিল, আরে তোমার হ'ল কি ?

—হবে আবার কি ? হ্যাঁ ইয়ে হয়েছে, আমার বড় মাথা ধরেছে।

—তা হলেও তোমার যাওয়া উচিত, সবাই তোমায় খুঁজছিল।

—কি আমার উচিত দেখাও হে কটাহরি, আর সবারই বা কি ধার ধারি আমি ? কে আমার কি—

—আরে তুমি এত চটছ কেন ? সে যাবার সময় তোমার কথাই দশবার করে বলে গিয়েছে, বিপিন দাকে বলো, বিপিন দাকে বলো—তা এতে—

বিপিনের কানে সংবাদের সুর ফিরিয়া গেল। সে তাহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া কহিল—কি ব্যাপারটা বল দেখি ?

—শ্রীমন্তের পাঁচ বছর জেল হয়েছে—

—এঁ্যা বলো কি ? হরি, হরি, হরি—

বিপিন রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া শ্রীমন্তের বাড়ীর পথ ধরিল। বক্তা কটাহরি বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই আপন পথে চলিয়া গেল। শ্রীমন্তের বাড়ীতে তখনও গোলযোগ মেটে নাই।—শ্রীমন্তের সঙ্গে গিয়াছিল বেহারী বাগ্দী, ওস্তাদের ভাইপো পাঁচু, সেই আসিয়া খবর দিয়াছে। সে বর্ণনা করিতেছিল আর পাঁচ সাত জন শুনিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল।

পাঁচু বলিতেছিল, তা মরদ বলতে হবে ছিমন্তকে, একফোঁটা জল

মাটীতে ফেলে নাই সে। যেমন লাঠী ধরে মরদের কাজ করেছে তেমনি মরদের মতই জেলে গিয়েচে সে—। একবার শুধু ওপর পানে হাত দেখিয়ে বল্লে—‘ও বিচার ত এখানে হ’ল না—হবে ওইখানে,—মানুষের বিচার মানুষে কি করতে পারে?’—তা সে হাকিমের মুখের ছামুতেই।

একজন কহিল—নাঃ—মরদ বটে শ্রীমন্ত,—সে গায়ের সামর্থ্যেই কি আর কলিজেই বা কি?

পাঁচুর কথা তখনও ফুরায় নাই। সে ছোট জাত, তাহাদের ভালবাসাটা বড় তীক্ষ্ণ—বড় গাঢ়। তাহারা শ্রীমন্তকে ভালবাসিয়াছিল, তাই তাহার কথার সবগুলি না কহিয়া বোধকরি তাহার আশা মিটিতেছিল না। সে কহিল—আর বল্লে গোটাকত কথা নিজের উকীলকে।—উকীল বল্লে কি না—‘কি আর করব বাপু, এ জানা কথা,—মামলা তোমার বড় দুর্ব্বল ছিল—তা সাত বছর না হয়ে পাঁচ বছর করেছি এই ঢের।’ তাতেই ছিমন্ত একটুকুন হাসলে।—সে হাসি যদি দেখতে! বুঝলে, সেই হাসিতেই উকীলের মাথা হেঁট হয়ে গেল,—হেসে ছি-মন্ত বল্লে—‘তাই সাত বছরই আমি খাটতে রাজী আছি উকীল বাবু, ফিসের টাকা কটা ফিরিয়ে দেন দেখি। কেন মিছে আমার সর্ব্বনাশটী কল্লেন বলুন ত?’ তারপর আবার হেসে বল্লে—‘মিছাই বলা তা জানি, তবু বল্লাম আপনাকে। কিছু থাকলে ত আর পরিবারটা না খেয়ে মরত না। তা আনা চার, পয়সা দেন কেনে, জেল-ফটকে জমা থাকবে বেরিয়ে দড়ি কিনে গলায় দোব।’ বলে আবার সেই হাসি।

একজন কহিল—আ-হা ঘা-টা বড্ড লেগেছে কিনা। মেয়েটাকে মানুষ কল্লে, তার মেমতা তো সোজা নয়, সেই মেয়ে ধর ফেলে পেটের অধিক, তাকে বাঁচাতে গিয়ে—

একজন কহিল—ওই মেয়েটাই অলুক্ষণে হে, দেখেছ—কটা কটা রং, প্যাজের পাতার মত চুলগোলা শুদ্ধ কটা ছিল, উ ভা-রী খারাপ, রাহুগ্-গন্ত না কি বলে বাপু। আমাদের ঐ যে চণ্ডীদাসপুরের রামের মেয়েটা ঠিক অমনি, হ'ল আর বাপকে খেলে। তারপর জমিজোরাত—পিটিলী শুল্‌তে এক কাঠা রইল না।

বিপিন পাঁচুকে কহিল, বাড়ীতে কিছু বলে দেয় নাই?

সে তাহার নিজের কথাটা শুনিতে চাহিতেছিল।

পাঁচু কহিল, তোমার কথা ত দশবার বলে দিয়েছে। বল্লে, 'পাঁচু কি আর বলে যাব ভাই, দেখিস তোরা বৌটা রইল যেন না খেয়ে মরে না।' আবার হেসে বল্লে—'তোরাই পাসনা খেতে ত পরের ভার কেনে দিই, তোরা বিপদে আপদে দেখিস। আর বিপিন দাদাকে বলিস—পারে ত ধান টান ভানিয়ে দুমুঠো খেতে যাতে পায় বৌটা তাই যেন করে।' আবার একবার বল্লে—'বিপিন দাকে বলিস—যদি বেঁচে থাকি আর জেল থেকে বেরিয়ে যদি দিন পাই তবে তার দেনা আমি শোধ করব, তার টাকা আমি মারব না।' আর বল্লে 'গাঁয়ে সবাই কিছু কিছু পাবে, তা বলিস যেন আমাকে শাপ শাপান্ত করেই মাপ দেয়, বৌটাকে আর কেউ কিছু না বলে।' আমি বল্লাম 'বৌকে কিছু বলবে?' বল্লে 'কি বলব? বলিস তার অদেষ্ট আর আমার অদেষ্ট। আর তাকে কিছু বলব না, থেকেও ত সুখ কখনও দিতে পারি নাই, তবে সে আমাকে দুখও কখন দেয় নাই।'

সহসা নারী-কণ্ঠের মর্ম্মফাটা কান্নার একটুখানি ধ্বনি মুহূর্ত্তের জন্য উঠিয়াই নীরব হইয়া গেল। সকলের দৃষ্টি পড়িল ও-ঘরের দাওয়ার উপর—গিরি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আপাদমস্তক আবৃত, দেহখানা থরথর কম্পিত হইতেছে। সকলেই বুঝিল হতভাগীর বুক

কাটিয়া যাইতেছে,—একমুহূর্ত্তের জন্ম নারীধৈর্য্যের সীমা টুটিয়া মুখও [illegible]।

পাঁচু কহিল, না না আর নয়, চল সব, একটুকুন কাঁদুক ও ডাক ছেড়ে, কি বল মোটা মোড়ল ? বলিয়া সে বিপিনের মুখপানে চাহিল। বিপিনও তাড়াতাড়ি কহিল—হ্যাঁ হ্যাঁ চল সব চল ; আ-হা-হা অবলা। পাচু, বলে দে দোর-টোরগুলো দিতে।

পাঁচু কহিল, না, মাকে আমার পাঠিয়ে দোব, সে দিয়ে শোবে। একা কি থাকতে পারে বৌ মানুষ।

বিপিনের কেমন কথাটা মনোমত হইল না—তা আবার পারবে না কি হয়েছে, নিজেরই ঘর—কতজনা বলে—

পাঁচু কহিল, তা নয়, বলি আজ কি একা থাকতে পারে, না থাকতে দিতে আছে ? বলি মনের বিবাগীতে ত কত রকম করতে পারে ; ধর, ঘরে দড়িও আছে পুকুরে জলও আছে।

বিপিন শিহরিয়া কহিল, হ্যাঁ—তা পারে। তাহার চক্ষের উপর স্বামীপরায়ণা বধূটার ধ্যান-মগ্না ছবিটী ভাসিতেছিল।

চৌদ্দ

পরদিন প্রাতে পাঁচুর মা যাইবার সময় কহিল, বৌ, তা হ'লে আমি আসি, যদি কিছু কাজ থাকে ত' বল ক'রে দিয়ে যাই।

কাজ ! গিরির হাসি আসিল, অপরে তাহার কাজ করিয়া দিবে ! দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া তাহার কপাল ফিরিয়া গেল যে ! কাজ এখন কত লোকের দুয়ারে তাহাকেই করিতে হইবে। সে ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, না।

পাঁচুর মা গিরির ওই ম্লান হাসিতে বোধ করি তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল, সে কহিল, সে কাজের কথা বলি নাই মা, বলি দোকানে আনতে নিতে যদি কিছু হয়, এই আর কি।

—কি আনবে ?

—এই নুন, তেল, খেতে ত হবে মা, পেট ত অভর, পেট ত মানবে না মা। আর না খাবেই বা কেনে, লোক বিধবা হচ্ছে, বেটা মরছে তাও ত বেঁচে আছে, আর তোমার ত এ পাঁচ বছর, দেখতে দেখতে চলে যাবে। ওই ত আট বছর পরে আমাদের পাড়ার 'ইন্দি' ফিরে এল। আট বছর, তাও কালাপাণি জাহাজে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, পাথরের জেল, বিচিতির পাতা তুলতে হয়, হাত ফুলে উঠে, আর এ ত তোমার দেশের জেল, এখানে ত রাজার হাল।

গিরি কহিল, সে আমি ভাবি নাই পাঁচুর মা—

—না, ভাবনা হয় বৈকি, তবে মা কি করবে বল—রাজার ওপরে হাত ত নাই, বলে যে সেই 'রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন বীর।'

গিরি আর উত্তর করে না, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে।

পাঁচুর মাও একটু নীরব থাকিয়া বলে, তা তোমার একটু কষ্ট বেশী হবে, পেটের একটা নাই যে দুঃখের সময়—

গিরি চমকিত হইয়া কহে, ও কথা ব'লোনা পাঁচুর মা, ওতে কাজ নাই আমার, ওযে হয় নাই সে দেবতার অনেক দয়া আমার উপর।

—ছিঃ—মা, সধবা নারী ও কথা বলতে নাই, কেন, কিসের জন্ত এমন কথা বলছ তুমি—?

গিরি কথাটা বলিয়াই বুঝিয়াছিল যে কথাটা বলা ভাল হয় নাই, এ প্রশ্নের উত্তরে যে ইতিহাস তাহাকে বলিতে হয়—সে ত শুধু দুঃখের নয়, —অত বড় মর্ম্মান্তিক ভাগ্যহীনতার অপমান নারীর আর হয় না। সে কথাটা একটু ঘুরাইয়া কহিল, আজ কি হ'ত মা,—আজ যে সে আমার পেটের শত্রু হয়ে দাঁড়াত।

পাঁচুর মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নীরব রহিল। সেও বিচার করিয়া দেখিল, বৌ কথাটা সত্যই বলিয়াছে—দরিদ্রের সন্তান শত্রু-ই বটে!

পাঁচুর মা এবার পা বাড়াইয়া কহিল, তা হলে আমি মা আসি, তুমি রান্না কর; কি করব বল মা ছোট জাত আমরা, নিজের জাত হলে কি তোমাকে রেঁধে খেতে হয়—

গিরি হাসিয়া কহিল, জাতের আর কি আছে বল পাঁচুর মা, সত্যি জাত থাকলে তো? আসলে ওসব মিছে,—জাত ত এখন দু'টী, বড় লোক আর গরীব লোক,—যারা বড়লোক তারাই উঁচু জাত আর যারা গরীব তারাই ছোট জাত।

পাঁচুর মার যাওয়া হইল না। দরিদ্রের সন্তান ওরা, একথায় মন তাহার একান্তভাবে সায় দিল, সে কহিল, ই কথাটী তুমি সত্যি বলেছ মা।

বাহির হইতে একটা ডাক শোনা গেল, পাঁচুর মা রয়েছ না কি?

পাঁচুর মা কহিল, কে গো, মোটা মোড়ল না কি, এস, এস।

বিপিনকে গ্রামে মোটা মোড়ল বলিত; দেহের স্থূলতা অবশ্য ছিল তাহার, কিন্তু সে জন্য নয়, জমিদারের সেরেস্তায় বিপিনের টাকার অঙ্ক মোটা, তাই জমিদার তরফ হইতে এ নাম-করণ হইয়াছে। বিপিন ইহাতে বেশ গৌরব অনুভবই করে, এ তাহার সরকারী খেতাব।

গিন্নি চকিত হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিবার পূর্ব্বেই বিপিন আসিয়া ও-ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইল। কথাটা তাহার বলা হইল না। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

বিপিন কহিল, তাইত পাঁচুর মা, কি ঘটনাটাই ঘটে গেল, বিধির নির্ব্বন্ধ আর কি। ছোঁড়া লোক বড় ভালই ছিল, আমার সঙ্গে প্রণয়টা বড়ই ছিল, সে নিজের ভাইএর তুল্যই মনে করত আমাকে, আমিও তাই। জিগ্যেস কর ওই বউকে, টাকা নিয়েছে সে, কখনও চাই নাই আমি। বলি আহা সময়টা খারাপ পড়েছে, দেবে, দিন হলেই দেবে,—আবার তার ওপর না চাইতে নিজে এসে দিয়ে গিয়েছি আমি। এইত সে কাল, বলি আহা খরচ নাই মামলার, তা চায় নাই, নিজেই দিইছি আমি, বুঝলে কি না।

পাঁচুর মা কহিল, সে একশবার। তা ছিমন্তের কথাও বলতে হবে, বাপু, সেত আমাদের পাড়া হামেশাই যেত, তা সে নাম করত তোমার, —বলত, হ্যাঁ মানুষের মত মানুষ আমাদের মোটা মোড়ল, সে নেমখারাম ছিল না, তুমি ভালবাসতে—তোমার নাম করতো। তা ধর কেন যাবার সময় সব পাঁচুকেই ত আমার বলে গিয়েছে, দশবার তোমার নাম করেছে—বলেছে, 'পাঁচু, বৌ রইল মোটা মোড়লকে দেখতে বলিস'।

বিপিন তাহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া কহিল, বৌ রইল—বিপিনদাকে দেখতে বলিস; তা দেখব বৈ কি।—ধর না কেন পাঁচুর মা —চোপর রাত্তি আমার কাল ঘুম হয় নাই, ভাবনায় ঘুম হয় নাই, বলি একা বৌটী সোমত্থ বয়সে—আমাকে রা-কাড়ে না—এ আমি করব কি?

পাঁচুর মা কহিল, তাত বটেই, ভাবনার কথা বটেই ত,—বৌ মানুষ, সোমথ বয়েস—রা-ই বা কাড়ে কি ক'রে?

বিপিন কহে, তা অবিশ্যি আসতে যেতে হলে—অনেকটা সরল হবে বৈ কি,—আর ধরগা যেয়ে, সম্পর্ক যা তাত গাঁ সম্পর্ক।

পাঁচুর মা কহে, তা বৈ কি—গাঁ সম্পর্কে মুচী মিন্সে মামা হয়, সেও ত ধর ফেল্না নয়; তবে হ্যাঁ এলে গেলেই সরল হবে বৈ কি, বলে ভাসুরকে রা কেড়েই আজ কাল হুর ধুর করচে—।

বিপিনের কথাটা বড়ই মনোনীত হইল, এই। হুর ধুর করচে, আমিও ত তাই বলচি গাঁ সম্পর্ক তো,—আসা যাওয়া যখন—

অধিক আসা-যাওয়ার অভ্যাসে কথা কওয়ার পথ আর সরল করিতে হইল না, গিরির কণ্ঠস্বর এখনই শোনা গেল—সে বেশ স্ফুট কণ্ঠেই কহিল, পাঁচুর মা, আসা যাওয়া করতে ওঁকে হবে না, আমিই দরকার হ'লে দিদিকে সব জানিয়ে আসব।

বিপিন হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার মনের আগুনের আঁচ এ মেয়েটি পাইল কি করিয়া?

মানুষ বোঝে না—তাহার যে মন, সে মন সৃষ্টি করিয়াছে সর্ব্বান্তর্যামী যে সেই। আর সৃষ্টি করিয়াছে সে আপন সর্ব্বান্তর্যামী মনেরই খানিকটা লইয়া, তাহার সেই সকল-জানা শক্তি-ই মানুষের মনের অনুমান-শক্তি, তাহাকেই মানুষ বলে দূরদৃষ্টি, তাই হেলায় খেলায় মানুষ যাহা অনুমান করে—তাহা ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু অন্তর সমর্পণ করিয়া যে অনুমান, সে হয় সত্য, প্রত্যক্ষ!

পাঁচুর মা কহিল—সেই ভাল মোটা মোড়ল, বৌমা আমার বলেছে খুব ভাল। কাজ কি আসা যাওয়ার, দরকার হলে তোমাদের বাড়ীতে বলে আসবে।

বিপিন বলিল, তা বেশ।—তবে কি পাঁচুর মা, ধরগা যেয়ে—মেয়েমানুষ দেওয়া-থোওয়া বড় দেখতে পারে না।

গিরি এবার বেশ সুস্পষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেওয়া-থোওয়ার ত কোন দরকার নেই পাঁচুর-মা। দেহ আছে—খেটে খাব আমি।

শশব্যস্ত হইয়া বিপিন বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বটেই—

গিরির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, অনেক বেলা হয়েছে পাঁচুর-মা, তুমি ওঁকে যেতে বল,—আমি বেরুতে পারছিনা।

বিপিন ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিতেছিল।

গিরি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া পাঁচুর-মাকে কহিল; দেখছ আমি বেরুতে পারছিনা, আর তোমার কথার শেষ হয় না।

পাঁচুর-মা বলিল, কি করব বল মা, এতবড় লোকটা—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া গিরি আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, বড়লোক ত আমার দরকার নেই পাঁচুর-মা। আমি গরীব। বড়লোক আমার দু'চক্ষের বিষ।

তাহার কণ্ঠস্বরে ঘৃণা যেন উপচিয়া পড়িতেছিল। সারা মুখখানি ঘৃণার রেখায়-রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, চোখ দুইটী স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অতি তীব্র, তীক্ষ্ণ সে দৃষ্টির সম্মুখে পাঁচুর-মা কেমন হইয়া গেল, তাহার মত মুখরার মুখ ফুটিলনা।

পনের

ভাবপ্রবণতার দিক দিয়া যতই শোভনীয় হোক, দেখিতে শুনিতে যতই সুন্দর হোক না কেন, বাস্তবতার এই কঠোর দুনিয়ায় এই বেণের কারবারে,—যেখানে ডান হাতটী তুমি না দিলে অপরের বাম হাতের সাহায্য পাইবে না, সেখানে বিপিনকে এই অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া গিরির সঙ্গত বা বিবেচনাসম্মত হয় নাই—এ বলিতেই হইবে।

বিপিন ধনী। বিপিনই একমাত্র ব্যক্তি যে গ্রামের মধ্যে গিরির মুখপানে চাহিতেছিল—তা সে যত নীচ স্বার্থেই হোক। এ দুনিয়ায় ধনের একটা মত্ততা আছে,—কৃত্রিম বিনয়ে ধনী মুখে যতই বৈষ্ণবী বুলি আওড়াক—তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ও স্বচ্ছলতার একটা অভিমান আছে। এই অহঙ্কারে অভিমানে দুনিয়ার উপর তাহার দাবী, দুনিয়া তাহার সম্মান করিবে, মানুষের মাথার উপর দিয়া তার পায়ের তলার পথ তৈরী না হোক—তার পায়ের গোড়ায় মানুষের মাথা নত হইবে। ধনের জোরে জনকে সে কিনিয়াছে মনে করে। আর সাধারণ দুনিয়ায় এই যুগে বেণেতীর কারবারে আপনাকে মানুষের বিক্রয়ও করিতে হয়; নতুবা মানুষ তাহার হাতের মুঠা বন্ধ করিয়া অনাহারে দুনিয়াকে মারিবে। মাঝে মাঝে গিরির মত অবিবেচনার কার্য্যে ক্ষণিকের জন্য নতুন ধারার মানুষের দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সে ঐ ক্ষণিকেরই জন্য; ক্ষণিকের জন্য আপনাকে ভাসাইয়া তুলিয়া সে আবার তলাইয়া যায়।

যাক্, যাহা বলিবার কথা তাহা এই—গিরির প্রত্যাখ্যানে বিপিনের ধনের অহঙ্কারে ঘা লাগিতেছে, সে অপমান বোধ করিয়াছিল। সে

গিরিকে সাহায্যের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। শুদ্ধ যে নির্লিপ্তভাবে ত্যাগ করিল তাহা নয়, তাহাকে জব্দ করার প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। সে আপন ঘরে খায়-দায়, গিরির কথা মনে অহরহ ভাবে কিন্তু প্রকাশ্যে কোন খোঁজখবরই লয় না। পথে ঘাটে পাঁচুর মায়ের সঙ্গে দেখা হইলেও প্রসঙ্গক্রমে ও কথা তোলে না।

'খাইতে না দিয়া বাজীকর বাঘ বশ করে', এ কথাটার উপর অগাধ বিশ্বাস বিপিনের।

গিরির মনেও একটা সঙ্কল্প ছিল—সে ধনকে অবহেলা করিবে, ঘৃণা করিবে, ধনীর দুয়ারে সে হাত পাতিবে না। বিশেষ করিয়া ওই বিপিনের সংস্রবে সে প্রাণান্তেও আসিবে না। সে পাঁচুর মাকে কহিল—পাঁচুর মা, তোমরা ত খেটে খাও, কি খাটুনী তোমাদের জোটে?

পাচুর মা কহিল—আমাদের কথা বাদ দাও মা, পুরুষে খেটে আনে, আমরা মেয়েরা দু'টো মাছ ধরে আনি, দু'টো শাক-পাতা তুলে আনি, সে কি দিন চলা—না বেঁচে থাকা!—

গিরি কহিল—যাদের বাড়ীতে পুরুষ নেই—?

—পুরুষ যাদের নাই, তাদের মা শতেক-খোয়ার, তারা কেউ খেতে পায় না,—আবার কারু রাজার হাল।

গিরি চমকিত হইয়া কহে—রাজার হাল? সে কি ক'রে হয় পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—সে কথা শুনতে তোমাদের নেই মা; তোমরা সৎ জাত—

গিরি উত্তপ্ত হইয়া কহিল—জাতের কথা তুলো না পাঁচুর মা। বামুন বাগ্দী বলে জাত আর নাই, আছে বড় লোক আর গরীব লোক।—আমি ত বলেছি, আমি গরীব—আমি তোমাদের সঙ্গে একজাত।

পাঁচুর মা বিব্রত হইয়া কহিল, তা হোক, সে শুনে কি করবে মা?

গিরি দৃঢ় কণ্ঠে কহিল—না তুমি বল—।

পাঁচুর মা ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল—ইজ্জৎ বিক্রী করে মা, তারা বলে খেয়ে পরে ত বাঁচি—তার পর ধম্ম। ধম্ম আমায় স্বগ্গে দেবে,—তা স্বগ্গে আমার কাজ নাই। সে—তুমি—

গিরি বাধা দিয়া কহিল—থাম পাঁচুর মা,—ও কথা ত বলতে আমি বলি নাই তোমাকে—

পাঁচুর মা অবাক হইয়া গেল, কহিল—সে কি বৌমা, তুমিই ত জোর করে,—

উত্তেজিতা গিরি অতি দৃঢ়তার সহিত কহিল—কক্ষণো না,—কক্ষণো আমি ও কথা বলতে বলি নাই তোমাকে।—

পাঁচুর মা এই মেয়েটীর অন্ত পাইল না, সে ভাবিতে লাগিল এ কি ধারার মানুষ ?

অনেকক্ষণ পর কহিল—এক কাজ কর বৌমা, তুমি ধান ভানার কাজ কর, তুমি সিজে ভাপা করবে, আমি তোমার ভেনে কুটে দেব ;—তাতেই তোমার একটা পেট—

গিরি বর্তাইয়া গেল—সে পরম কৃতজ্ঞতাভরে কহিল, সে ত খুব ভাল হয় পাঁচুর মা, কিন্তু ধান দেবে কে—?

পাঁচুর মা হাসিয়া পরম তাচ্ছিল্যভরে কহিল—তার ভাবনা কি ? আজই আমি মোটা মোড়লকে বলছি—

—পাঁচুর মা !

গিরির কণ্ঠস্বরে পাঁচুর মা হতভম্ব হইয়া গেল, সে বুঝিতে পারিল না ইহার মধ্যে তাহার কি অপরাধ হইয়া গেল। বিস্ময়ের ঘোরটা তাহার কাটিতেই সে ঈষৎ উষ্মাভরে কহিল—কি ধারার মানুষ মা তুমি, রাগের কথা ত কিছু বলি নাই আমি !

এ উত্তরে গিরি শুধু অপ্রতিভই হইল না—আহতও হইল। সত্যই ত এরূপ রুক্ষতার হেতু কিছু হয় নাই। আর যদি হইয়াই থাকে, অজ্ঞাতে যদি কোন আঘাতই পাঁচুর মা দিয়া থাকে, যার জন্য ওকে দোষ দেওয়া চলে না, তার জন্য কটুকথা বলিবার তাহার অধিকারই বা কি? ওই যে নারীটী, দাসীবৃত্তি যার ব্যবসায়, যাহার উপর বহুযুগের সামাজিক অধিকারের প্রভুত্বের অভ্যাসে এই কটুকথা সে বলিয়াছে, তাহার উপর সত্যকার প্রভুত্বের দাবী ত' কিছু নাই তার। তবে থাকিত—থাকিতে পারিত; যদি তাহার অর্থ থাকিত।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখটী নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা সে কহিল—আর কারও ঘরে ধান পাওয়া যায় না পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—আর কার অবস্থা আছে মা? যে ধানটা তারা মজুরী দেবে সে ধানটা থাকলে তাদের পেটের ভাত হবে। এ গাঁয়ে ধান পরকে দিয়ে চাল করিয়ে নিতে এক ওই মোটা মোড়ল।

গিরি কহিল—দাসীবিত্তিও একটা মেলে না পাঁচুর মা?

—মেলে বৈকি মা, তবে এ গাঁয়ে দাসী রাখতেও ওই মোটা মোড়ল,— তবে সহরে বাইরে বেরুলে মেলে। তা তোমার এই সোমত্থ বয়সে, এ বয়সে ত মা বাইরে বেরুন হয় না, তার বিপদ অনেক।

গিরি ক্ষিপ্তার মত জিজ্ঞাসা করিল—ভাল ভাবে বেঁচে থাকবার কি কোন উপায় নাই পাঁচুর মা?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়ে পাঁচুর মা হতবাক্ হইয়া গেল, কতক্ষণ পর সে কহিল—আমি ত উপায় বল্লাম বৌমা, মোটা মোড়লের কাছে ধান নাও, ভান।

গিরি কহিল—না না, তুমি এখন যাও পাঁচুর মা, আমি একটু শুই। উত্তেজনায় তখন সর্ব্বশরীর তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া ফেঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে রুদ্ধ কান্না তাহার বুকের মাঝে কয়দিন হইতে স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে সব যেন আজ নিঃশেষে বাহির হইয়া আসিতে চায়। কান্না আজ তাহার সেই বিসর্জ্জিত শিশু-দেবতাটীর বিগ্রহের তরে, কান্না তাহার হতভাগ্য স্বামীর তরে, কান্না আজ তাহার নিজের তরে, জীবনের তরে। হায়, বাঁচিবার আর ত তাহার কোন উপায়ই নাই!

পাঁচুর মা যায় নাই, সে পরম স্নেহভরে তাহার সর্ব্ব অঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল—কেঁদ না মা, কেঁদ না ছিঃ—

গিরি ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিল—তুমি যাও, তুমি যাও পাঁচুর মা, আমায় একটু কাঁদতে দাও।

ষোল

গিরি সঙ্কল্প করিল সে মরিবে। এমন করিয়া আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচার অপেক্ষা মরণই সহস্র গুণে কাম্য! আর মরিবে সে এই অনাহারেই শুকাইয়া শুকাইয়া, তিলে তিলে দগ্ধ হইয়াই সে মরিবে, যেন তাহার যাতনার প্রতি দীর্ঘশ্বাসটী সে রাখিয়া যাইতে পারে। সে দীর্ঘশ্বাস যেন অভিশাপ হইয়া এই বিকিকিনির সংসারে বেণিয়ার অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মীর সোনার বর্ণ-টাকে মসীময় করিয়া দেয়। হায়রে, হতভাগিনী নারী জানে না ঐ রাক্ষসীর অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিতে, ঐ রাক্ষসীর চরণযুগলের অলক্তক রাগ যোগাইতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে কত লক্ষ বলি হইয়া যাইতেছে, তবু তাহার পায়ের রং মনোমত হইতেছে না, অধরোষ্ঠে হাসির রেখা ফুটিতেছে না!

এই সকল্প লইয়া পাঁচদিন সে কিছু খায় নাই। শুধু জলের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে। পাঁচুর মা কত সাধ্যসাধনা করিয়াছে, তবুও না। তাহাকে সে বলিয়াছে—শরীর বড় খারাপ পাঁচুর মা, আমার অসুখ ক'রেছে।

পাঁচুর মা নিজে হইতে সেদিন সেরখানেক চাল, কয়টা বেগুন, মূলা আনিয়া দিয়া কহিল,—বৌমা ওঠ, উঠে রেঁধে দু'টো খাও; না খেয়ে তোমার শরীরের এমন হাল হয়েছে, খেলে দেলেই শরীরে বল পাবে, ফূর্ত্তি পাবে।

গিরির মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছিল, সে অবজ্ঞাভরে সেই শ্রদ্ধার দানগুলাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল—আমার কি এতই দৈন্যদশা হয়েছে পাঁচুর মা যে, তোমার কাছেও ভিক্ষে আমায় নিতে হবে?

পাঁচুর মায়ের মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল, সে চাল তরকারিগুলি আপনার আঁচলে তুলিয়া নীরবে চলিয়া গেল। একটী কথাও বলিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না।

গিরি আপন মনেই আপনাকে কহিল—ওর ভিক্ষেই বা কেন নেব আমি ; তার চেয়ে যে আপনাকে বিক্রী করাও ভাল আমার।

এর পর হইতে পাঁচুর মা আর আসে নাই, গিরিও তাহাকে ডাকে নাই। সে আজ দু'দিনের কথা।

কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা! পেটের মধ্যে সমস্ত অন্ত্রগুলা যেন গুটাইয়া পাকাইয়া যাইতেছে। একটা দুঃসহ দাহে যেন ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছে। গিরি মাঝে মাঝে এক এক ঘটী জল ঢক্ ঢক্ করিয়া গেলে, পর মুহুর্ত্তে তাহাও বমি হইয়া সব উঠিয়া যায়। চার দিনের সন্ধ্যা হইতেই এ যাতনাটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রাতঃকাল হইতে মাঝে মাঝে যেন চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, দৃষ্টিতে কিছু পড়েনা, কানে কিছু আসে না, অথচ মন সবটুকু অনুভব করে! মরণের ছায়া-ছবি যেন চক্ষের সম্মুখে নাচিতেছে!

কি বীভৎস! গিরির মনে হইল চক্ষের সম্মুখে ওই অন্ধকার, ওই অন্ধকার দিয়া একখানা শিথিল কঙ্কালময় হস্ত ধরণীর সমস্ত ছবি তাহার চক্ষের সম্মুখে মুছিয়া দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিতেছে। তাহার আবরুদ্ধ কানের মধ্যে সেই কঙ্কালের কৌতুকের খিল্ খিল্ হাসি যেন বাজিয়া উঠিতেছে। সে যেন কৌতুক করিয়া বলিতেছে—বলত আমি কে?

সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া গিরি প্রাণপণে জাগিয়া উঠিতে চাহিল। আবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সেই অনুভূতি তাহাকে এই ধরণীর বুক হইতে সেই হাত খানা সবল আকর্ষণে যেন ছিনাইয়া লইয়া

াইতেছে। পিছনে তাহার অবহেলার ঘরদ্বার নির্ম্মম সংসার মমতাময়ী হইয়া তাহারই জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে।

সভয়ে আবার গিরি আপনাকে ঝাঁকি দিয়া সচেতন করিয়া তুলিল। শীতের প্রভাতে সেদিন সমস্ত ধরণী নিবিড় কুয়াসায় আচ্ছন্ন, বাষ্পকুণ্ডলীর মাঝে সব যেন লুপ্ত হইয়া যাইবে,—গাছের পাতা হইতে শিশিরবিন্দু বারিধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সুতীক্ষ্ণ হিমকণায় ধরণীর জীবন জর্জ্জর হইয়া উঠিয়াছে।

চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়াও গিরি দেখিল সমস্ত ধরণী ধূমাচ্ছন্ন। সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—পথ নাই, পথ নাই মাটীর বুকে ফিরিয়া যাইতে কি পথ নাই? অল্পক্ষণ পরে সে বুঝিল এ কুয়াসা, আশ্বস্ত হইয়া সে এদিক-ওদিকে চাহিল।

আহা! আহার! একটা কিছু, যা আহার করিয়া সে এই বিভীষিকার হাত হইতে নিস্তার পায়! সে খানিকটা জল ঢক্ ঢক্ করিয়া খাইল, পরক্ষণেই একটা উদগ্র উদ্গীরণের অনুভূতিতে সর্ব্বাঙ্গ মোচড় দিয়া উঠিল। সে আপ্রাণ চেষ্টায় উঠিয়া পায়ের কাছের লেবু গাছটার কয়টা পাতা কচ্লাইয়া শুঁকিতে আরম্ভ করিল; একটা লেবুও নজরে পড়িল। গাছটা খুব বড় নয়, গিরি ধীরে ধীরে দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া লেবুটাকে পাড়িয়া লইয়া, দাঁত দিয়া কাটিয়াই লেবুটা লেহন করিতে লাগিল।

লেবুটা চুষিয়া তাহার বমির ভাবটা কাটিতেই সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে এতক্ষণে তাহার নজরে পড়িল—দাওয়ার এক কোণে পড়িয়া একটা মূলা আর অতি অল্প কতকগুলা চাল, পাঁচুর মায়ের তুলিয়া-লইয়া-যাওয়া চাল-তরকারীর অবশেষ।

আতঙ্কে, বুভুক্ষায় গিরি মূলাটা লইয়া কচ্ কচ্ করিয়া চিবাইয়া খাইল। তারপর চাল ক'টা ঘটীর জলে ভিজাইয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। নিমীলিত চোখ হইতে দু' ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িল,—মরিতে পারিল না সেই দুঃখে, না মরণের হাত হইতে পরিত্রাণের আশ্বাসে কে জানে?

কতক্ষণ পরে চাল ক'টা সে অল্পে অল্পে চিবাইয়া খাইয়া ক্ষুধার দুর্দ্দান্ত জ্বালা কতকটা জুড়াইল : দেহেও যেন কতকটা বল পাইল।

রাজ্যের ভাবনা তাহার মাথায়, তাহাকে বাঁচিতে হইবে। মরিতে সে পারিবে না, মরণ অতি ভয়ঙ্কর, অতি বীভৎস! জ্ঞান সত্ত্বে, সাধ্য সত্ত্বে, সে ওই কঙ্কালের হিমানী স্পর্শময় আলিঙ্গনের ছোঁয়াচ সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু বাঁচিবেই বা কি করিয়া? এ দেনা-পাওনার সংসারে সম্বল না থাকিলে ত বাঁচা যায় না! স্বামী হোক্, স্ত্রী হোক্, মাতা হোক্, পুত্র হোক্—নিঃসম্বলের ত উপায় নাই! স্ত্রীর অক্ষমতা স্বামী ক্ষমা করে না, স্বামীর অক্ষমতা স্ত্রী ক্ষমা করে না। তাহার মনে পড়িল এই ত সেদিন শ্রীমন্ত তাহার কাছেই তাহার গোপন সম্বল হইতে কয়টা টাকা লইয়াছিল, তাহার জন্য সেই ত নিজে কত গঞ্জনা দিয়াছে। শ্রীমন্তের মুখের উপরই সে বলিয়াছিল—এমন চামার স্বামীর হাতে পড়ার চেয়ে মরণ ভাল।

সে সময়টা প্রাতঃকাল, সূর্য্যও তখন ভাল করিয়া উঠে নাই, যখন সারা রজনীর বিশ্রাম অন্তে মানুষ বিগত দুঃখ গ্লানি ভুলিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিমলানন্দ ভোগ করে, তখনই। শ্রীমন্তের মুখের কথা ফুটে নাই, সে শুধু বলিয়াছিল—সকাল বেলায় আমায় গাল দিয়ো না বলছি।

সে বলিয়াছিল—আমার নিলেই আমি বলব। গাল দেব।

তখন চোখ থাকিতে লক্ষ্যও করে নাই, ওই নিঃসম্বলের মুখখানা কেমন হইয়া গিয়াছিল। তখন মনেও একবার হয় নাই ওই মানুষটার বুকে এ আঘাত কতখানি লাগিতে পারে। আজ কথাটা মনে পড়িয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া ঝরিয়া পড়িল, মনে হইল হয়তো বা অক্ষয় হইয়া এ কাঁটা তাহার বুকে বসিয়া আছে। আবার মনে হইল, সেদিনের তাহার সে উষ্মা-সে ত সত্যই স্থায়ী নয়, সে অভাবের তাড়নায় মুহূর্ত্তের ভুল, সে বিকৃত ক্রোধ। পরক্ষণেই মনে হইল তাই বা কেন, এ অসন্তোষ ত অহরহ তাহার বুকেই ছিল, সে সত্য। বরং সে সত্যকে গোপন করিয়া মুখে হাসি মাখিয়া নিরীহ শ্রীমন্তকে সে এতদিন বঞ্চনা করিয়াই আসিয়াছে; ভালবাসার নামে প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে।

আত্ম-গ্লানির চরম উত্তেজনায় এক মুহূর্ত্তে তাহার নিজের সমস্ত জীবনটা যেন মেকী হইয়া দাঁড়াইল। কি দাম তাহাব ভালবাসার! দুইটা টাকা? তবে একশো, এক হাজার, পাঁচ হাজারের জন্য সে না পারে কি? ওইত দেনা-পাওনার কষ্টিপাথরে তাহার ভালবাসার রেখার মধ্যে খাদের অংশটাই জল্‌জল্ করিতেছে। গিরির অধরে একটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল। অদ্ভুত সে হাসি—সে হাসির রূপই স্বতন্ত্র। আনন্দই সংসারে হাসির উপাদান, কিন্তু গিরির হাসির রেখায় রেখায় জ্বালার তীব্র শিখা!

মিথ্যা, মিথ্যা, সে কাহাকেও ভালবাসে নাই, শ্রীমন্তকে না, গৌরীকে না। সে ভালবাসে শুধু নিজেকে, সমস্ত সংসারটার রূপ যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিমেষে পাল্টাইয়া গেল—ধরণীর সুশ্যাম অঙ্গাবরণ খানি মুহূর্ত্তে কে যেন উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল ইহার বীভৎস কদর্য্য ক্ষত-ভরা কুৎসিত স্বরূপ—ধরণীর সে যেন রাক্ষসী, ব্যভিচারিণী রূপ—ওই শ্যামাঞ্চলের আবরণ দিয়া রাক্ষসী উদরের জন্য

সন্তানের মাংস খায়, আপনাকে বিক্রয় করে, ব্যভিচারের ফল কুৎসিত ক্ষতে তাই তার সর্ব্বাঙ্গ ভরা! ধরণীর বুক চিরিলে পাওয়া যায় শুধু সন্তানের কঙ্কাল—মেদ মজ্জা, তাহাতেই ধরণী দিন দিন পুষ্ট হইতেছে।

গিরি উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল আপন অনশন-শীর্ণ দেহখানার পানে চাহিয়া, তাহার ধূলি-মলিন জীর্ণতার জন্য সারা অন্তর তাহার ঘৃণায় ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল, আরও ঘৃণা জাগিল তাহার আপন অঙ্গের জীর্ণ-মলিন বস্ত্রখানার জন্য!

সে আপনার ভাণ্ডার খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

ভাণ্ডার খুঁজিয়া বাহির হইল—ষষ্ঠীর পূজার জন্য চাহিয়া-আনা সেই আধ পোয়াটেক আতপ চাল, ঘরের কোণে ইঁদুরে খাওয়া কয়টা আলু। ইহাতেই তাহার এক বেলা চলিয়া যাইবে!

কাঠ-কুটা চাই, গিরি দ্বিধা না করিয়া সম্মুখের ঢেঁকি-ঘরের চালাটার খড়, বাতা টান মারিয়া ছাড়াইয়া লইল। দারুণ উত্তেজনায় অনশনের দুর্ব্বলতা তখন তাহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

চালাখানা হইয়া উঠিল কদর্য্য; সেদিকে গিরি একবার তাকাইলও না। উনানের মুখে সমস্ত গুলা জড় করিয়া ছেঁড়া গামছাখানা টানিয়া লইয়া খিড়কীর পথে সে বাহির হইয়া গেল।

দেহখানার ধূলিমালিন্য উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া কাপড় কাচিয়া ঘাটে উঠিল। হেঁট হইয়া সে কাপড় নিংড়াইতেছে, বক্ষবাস সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়া সম্মুখের পানে, নিবিড় কুয়াসার মধ্য দিয়াও একটা মানুষের একাংশ দেখা যায়, আর দেখা যায় একটা চোখ! অতি নিকটেই লোকটা দাঁড়াইয়া আছে। দৃষ্টির লোলুপতা দিয়া সে তাহার অঙ্গ যেন লেহন করিতেছে। শ্মশানচারী শকুন যেন সদ্য-পরিত্যক্ত শবের পানে বৃক্ষশীর্ষ হইতে চাহিয়া আছে!

দারুণ উত্তেজনায় গিরি যেন কেমন হইয়া গেল। সে সেই অনাবৃত অঙ্গেই সোজা দাঁড়াইয়া হাতছানিতে ওই লোকটীকে ডাকিয়া ত্বরিত পদে আপন ঘরে আসিয়া উঠিল।

গিরি বুঝিয়াছিল সে কে।

বিপিন যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল তখন গিরি কাপড় ছাড়িয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে।

অস্বাভাবিক রূপে প্রদীপ্ত মুখ, চক্ষে জ্বালা, সারা অঙ্গে শুদ্ধ দৃঢ় সংকল্পে উপবাসহেতু একটী মহিমান্বিত শীর্ণতা, ললাট পাণ্ডুর, ভাস্বর—একটী প্রদীপ্ত ব্রতচারিণীর রূপ! সে মূর্ত্তির সম্মুখে বিপিন যেন কেমন হইয়া গেল। সে তবু সাহস করিয়া কহিল—পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাওনি।

গিরি একদৃষ্টে ওই লোকটীর দিকে চাহিয়া ছিল, সে দৃষ্টিতে নারীর লজ্জা ছিল না, মাধুর্য্য ছিল না—ছিল শুধু ঘৃণা, জ্বালা। কি বীভৎস ওই লোকটী।

ভোগের পুষ্টিতে সর্ব্ব অঙ্গে মেদবহুল কদর্য্য স্থূলতা, মুখের রেখায় রেখায় কাপুরুষ ধূর্ত্ততার ছাপ, ছোট ছোট দু'টী চোখে শঙ্কিত কিন্তু লালসা-ভরা নির্ণিমেষ দৃষ্টি! গিরির ইচ্ছা করিতেছিল—বর্ব্বরটাকে সে হত্যা করে।

বিপিন গিরির এই তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিতেছিল। বুকের মধ্যে একটা কম্পন মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল সে পলাইয়া যায়; পলাইবার জন্য সে ফিরিলও কিন্তু লোভী মনের তাড়নায় সে আবার ঘুরিল।

আবার সে কহিল—পাঁচুর মা বলছিল তুমি ক'দিন খাও নি—

ওই একটী ব্যতীত অপর কোন সম্ভাষণ তার কম্পিত অন্তরে জাগিল না।

গিরি ক্ষিপ্তার মত সহসা কহিল—তাতে তোমার কি? তোমার কি?—কেন তুমি এমন নির্লজ্জের মত আমার পানে তাকিয়ে থাক,—কেন—কেন—

গিরি হাঁপাইতেছিল, অস্বাভাবিক জ্বালায় চোখ দুইটার প্রতি শিরাটী রক্তরাঙা, সমস্ত দেহ তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

বিপিন প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বৌ, আমি তোমায় ভালবাসি—

পরম ঘৃণাভরে গিরি কহিল—না—না—আমি চাই টাকা—ভাল খাবার, গহনা, কাপড়—

বাক্য আর শেষ হইল না—দুর্ব্বল দেহে বিপুল উত্তেজনায় গিরি জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল। দাওয়ার কানায় গাঁথা ইঁটের উপর কপালটায় আঘাত পাইয়া গভীর একটা ক্ষত হইয়া গেল, ক্ষতের রক্তে সমস্ত মুখখানা তাহার রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

কপালের রক্তধারা নাকের কোল বহিয়া ক্ষিপ্তা নারীটার ওষ্ঠ বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—যেন নিজের রক্ত সে নিজেই পান করিতেছে।

ও যেন ছিন্নমস্তা।

বিপিন পলাইয়া গেল।

চোখ মেলিয়া গিরি দেখিল—জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেছে—আর তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া পাঁচুর মা। পরম আশ্বাসে সে আবার চোখ মুদিল। আপনার কপালে হাত বুলাইয়া ক্ষতটা অনুভব করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বুকের জমা-করা সমস্ত গ্লানি যেন সে নিশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচুর মা কহিল—উঠতে পারবে মা! ওঠ দেখি। আস্তে আস্তে—ভাত ক'টা যে পুড়ে গেল। জল শুকাইয়া ভাত তখন ধরিয়া গিয়াছে, একটা দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

গিরির উদরের মধ্যে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল—আহার্য্যের নামে ক্ষুধাতুরার চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল, সে উঠিয়া বসিল। সমস্ত কথা-গুলা ভাবিয়া স্মরণ করিবার অবসর এমন কি প্রবৃত্তিও বোধ হয় হইল না; সে টলিতে টলিতে উঠিয়া গিয়া উনানের মুখে বসিয়া ঐ কদর্য্য দগ্ধ ভাতের হাঁড়িটা নামাইতে গেল।

পাঁচুর মা কহিল—ভিজে কাদা মাখা কাপড়খানা ছাড় মা আগে—

সে কথা যেন গিরির কানেই গেল না; সে কহিল—এক কাঁকড় নুন এনে দিতে পার পাঁচুর মা? এক কাঁকড় নুন!

দিবসান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইতে না ঘনাইতে সেদিন গিরি ঘুমে ঢলিয়া পড়িল। এ কয়টা দিনের ঘুম যেন নয়ন-রেখার তটভূমিতে অপেক্ষা করিয়া ছিল; লক্ষ্মীর প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল।

আরও একটী সুসংবাদে গিরির মন সেদিন আশ্বস্ত হইয়াছিল, পাঁচুর মা তাহার জন্য ধানের ব্যবস্থা করিয়াছে, ও-গাঁয়ের ভবি মোড়ল ধান দিতে রাজী হইয়াছে।

পাঁচুর মা সংবাদ দিতে গিরি যেন মূক হইয়া গেল, কোন্ ভাষায় কেমন করিয়া যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না।

পাঁচুর মা তাহার ওই নীরবতায় শঙ্কিত হইয়া উঠিল—এই সৃষ্টিছাড়া মেয়েটি যে আবার কি কহিয়া বসিবে, সে যে তাহার ধারণার অতীত।

এত করিয়াও যে সে মেয়েটির মনের কূল-কিনারা পাইল না।—সে শঙ্কিত ভাবে কহিল—কি বলছ মা, আমি ত কথা দিয়ে এসেছি—

গিরির চোখ দিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল—সে কহিল—কি বলব ভেবে যে পাচ্ছি না মা,—ইচ্ছে করছে তোমার গলাটা জড়িয়ে ধ'রে প্রাণ খুলে আজ কাঁদি; পাঁচুর মা, তুমি আমার আর জন্মে মা ছিলে!

স্বর্গ মানবচক্ষুর অগোচর—স্বর্গীয় বস্তুর সহিত মানুষের পরিচয় নাই, কিন্তু পাঁচুর মার মুখে যে হাসি, যে তৃপ্তির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল তার একমাত্র বিশেষণ ওই স্বর্গীয়; সে কৃত্রিম বিনয়ে এ কৃতজ্ঞতা প্রত্যাখ্যান করিল না।

নিরক্ষরা সরলা পল্লীনারীটি এক মুখ হাসিয়া কহিল—তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে মা।

আরও দুই চারিটা কথার পর পাঁচুর মা চলিয়া গেলে—গিরি আঁচল পাতিয়া মাটীর উপর শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। প্রভাতের কুয়াসা কাটিয়া গেছে—আকাশ প্রগাঢ় নীল; শীতের মধ্যাহ্নের সূর্য্য-কিরণে ধরণী যেন কত উপভোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের বুকে মিশিয়া চলমান বিন্দুর মত কয়টী চিল নিরন্তর ঊর্দ্ধে উড়িয়া চলিয়াছে। দূরে পালেদের বাঁশ-বনের শীর্ষগুলি বায়ু-প্রবাহে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে।

গিরির আজ এগুলি বেশ লাগিল।

দাওয়ার কোলে করবী গাছটী রাঙা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। গিরির মনে পড়িল এ গাছটি তাহার নিজের হাতে রোপিত। কিন্তু যার পরিচর্য্যায় সে আজ এমন রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে গৌরী।

আহা, আজ যদি গৌরী কাছে থাকিত

সম্মুখে চালাটার উপর দুইটা পায়রা বসিয়া একটা অপরটার মুখে আহার তুলিয়া দিতেছিল। একটি মা অপরটী সন্তান। ছানাটা পাখার ঝাপ্টা দিয়া আগাইয়া আসিয়া আহারের দাবী করিতেছিল,—মা উড়িয়া গেল, ছানা পারিল না। সে ফিরিয়া ছানাটাকে চঞ্চুর আঘাতে চঞ্চল করিয়া আবার উড়িল, এবার ছানাটাও উড়িল।

গিরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখ ঘুরাইল।

হায়! তাহার বুক জুড়িয়া যদি একটী শিশু থাকিত! সেও তাহার অবসর তাহাকে লইয়া এমনি ভাবে কাটাইতে পারিত!

ওই বিষণ্ণ অবসন্নতার মধ্যেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

একটা আর্ত্ত কলরোলে তাহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল, চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

বাগ্দীপাড়ায় কাহারা যেন কলরোল করিয়া কাঁদে! গিরি কান পাতিয়া শুনিল—সমস্ত কলরোল ছাপাইয়া নারীকণ্ঠে কে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া মর্ম্মস্পর্শী কান্না কাঁদিতেছে! বিলাপের ভাষাও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু স্পষ্ট হইয়া কানে আসিয়া ধরা দেয়।

ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার—

গিরির বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি গিয়া সম্মুখের মুক্ত দুয়ারটা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে অন্ধকারে বসিয়া হাঁপাইতেছিল।

কতক্ষণ পর কে জানে পাঁচুর মায়ের গলা শোনা গেল—কৈ গো, বৌমা কৈ? বলি ঘরে রয়েছ না কি?

গিরি দুয়ার খুলিয়া দুয়ারের বাজু ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বাগ্দীপাড়ার কলরোল নীরব হইয়া গেছে, কিন্তু নারী-কণ্ঠের সুকরুণ বিলাপ মন্থর গতিতে তখনও চলিয়াছে। বেশ বোঝা যায় শোকাতুরার দেহ

যেন আর পারে না—কিন্তু প্রাণ মানিতেছে না—দূর সুদূর কোন অদৃশ্য-লোক পর্য্যন্ত আহ্বান করিয়া হারানো সোনাকে তাহার ফিরাইতে চায় সে—

ওরে সোনা—ওরে যাদু আমার রে!

পাঁচুর মা বলিতেছিল—মনে করলাম দুপুর বেলায় এসে উঠোনটা ঢেঁকিশালটা নিকিয়ে যাব—তা বাড়ী গিয়ে এক বিপদ—

গিরি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—কে এমন করে কাঁদছে পাঁচুর মা!

পাঁচুর মা কহিল—তাইত বলছি মা—গিয়েই দেখি আমাদের গোকুলের সন্তানটী নষ্ট হ'ল—এই নিয়ে পাঁচটী গেল। কি যে দোষ ধরেছে মা, কোঁকে একটা হ'লেই কোলেরটা যাবে। এই আবার পোয়াতি—সঙ্গে সঙ্গে কোলেরটা গেল।

আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে গিরি কহিল—যা করতে হয় কর পাঁচুর মা, আমায় আর ডেকো না, আমার বড় মাথা ধরেছে।

পাঁচুর মা কহিল—এই অবেলায়—একেবারে কাপড়-চোপড় কেচে—

গিরি কহিয়া উঠিল—না না পাঁচুর মা, ও কান্না আমি সইতে পারি না আমায় ডেকো না।

সে আবার ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

অন্ধকার গৃহ-মধ্যে উপাধানে মুখ গুঁজিয়া গিরি শুইয়া পড়িল। রুদ্ধ দ্বারে সন্তানহারা হতভাগিনীর বিলাপধ্বনি প্রতিহত হইয়া বায়ুপ্রবাহ দিক-দিগন্তরে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

রুদ্ধদ্বারের এ পাশে শুধু শোনা যায় বিলাপের অতি ক্ষীণ রেশ একটী; মাঝে মাঝে দুই একটা শব্দ!

গিরির মনে হইল—তাহার ভাগ্য ভাল, তাহার এই বঞ্চনার

বেদনার চেয়ে ওই বিয়োগের দুঃখ ঢের, ঢের বড়! কিন্তু এ চিন্তায় সে আনন্দ পাইল না। একটী সকরুণ ম্লানিমায় মন তাহার কেমন উদাসী হইয়া উঠিল—শূন্য মন, শূন্য সংসার—শূন্য দৃষ্টিতে সে ওই অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

এমনি অবস্থায় আবার কখন সে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে নিদ্রা ভাঙিল তাহার রুদ্ধদ্বারে কাহার মৃদু করাঘাতে। কে যেন ডাকে!

গিরি উঠিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ নীরব সব—পাখী ডাকে না, মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। ঘরের জীর্ণ ছিদ্রময় চালের মধ্য দিয়া ব্যোমপথ দেখা যায়—অস্পষ্ট অন্ধকার, আরও উর্দ্ধে দেখা যায় খানিকটা আকাশ, সে আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ-নীল—কয়টী প্রদীপ্ত, প্রোজ্জ্বল বিন্দু। গিরি বুঝিল দিনের অবসান হইয়া গেছে, এ রাত্রি!

রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। গিরি বুঝিল পাঁচুর মা শুইতে আসিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া ডাকিল—পাঁচুর মা!

দাওয়ার উপর খানিকটা চাঁদের আলো তেরছা ভাবে সুশান্ত মহিমায় পড়িয়া ছিল—তাহারই আভায় উপরের অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। গিরি দেখিল দুয়ারের পাশে একটী মানুষ দাঁড়াইয়া, জ্যোৎস্নার স্বচ্ছতার মধ্যে গিরির মানুষটিকে চিনিতে বিলম্ব হইল না,—সে বিপিন!

চীৎকার করিতে তাহার স্বর ফুটিল না, ঘরে ঢুকিতে পা উঠিল না—এক মুহূর্ত্তে গিরি যেন কেমন হইয়া গেল।

নিস্পন্দ, নির্ব্বাক!

দাওয়ার চন্দ্রালোকদীপ্ত অংশটুকুর উপর বিপিন কি নামাইয়া দিল। চন্দ্রালোকের মৃদু অস্পষ্টতার মধ্যে প্রদীপ্তরূপে দেখা না গেলেও

জিনিষ চেনা গেল—একখানি ডালায় সাজান জিনিষের সম্ভার! একদিকে দেখা যায় কাপড়, তাহারই পাশে নতুন বাটীতে বোধ করি আহার্য্য, এদিকে আরও কত কি পূর্ণরূপে চেনা যায় না, কিন্তু ওই এমন মৃদুস্নিগ্ধ আলোকেও সেগুলা ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠে, কাচের জিনিষ বলিয়া বোধ হয়।

গিরি এক দৃষ্টিতে ওই দ্রব্যসম্ভারের পানে চাহিয়া রহিল।

বিপিন মৃদুস্বরে আবার কহিল—তুমি চেয়েছিলে বৌ।

গিরির তবু কোন সাড়া নাই, তাহার দৃষ্টি ওই দ্রব্যসম্ভারের উপর।

বিপিন ভরসা পাইল, কহিল—কাপড় এনেছি, খাবার এনেছি, তেল, সাবান, চিরুণী, আলতা—সব এনেছি, টাকা নাও, গয়না আমি দেব আরও—সহসা বিপিন নীরব হইয়া চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের ঢেঁকিশালার অস্পষ্ট অন্ধকার হইতে কে ডাকিয়া উঠিল—মোটা মোড়ল!

বিপিন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঢেঁকিশালার দিকে না চাহিয়াও সে বুঝিয়াছিল সে কে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসম্বরণ করিয়া ত্বরিত পদে খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। গিরি তখনও তেমনি দাঁড়াইয়া।

ঢেঁকিশালায় দাঁড়াইয়া ছিল পাঁচুর মা আর পাঁচু। পাঁচু মাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিল।

পাঁচুর মা উঠানে নামিয়া আসিতেই পাঁচু কহিল—মা!

পাঁচুর মা ফিরিয়া দাঁড়াইলে পাঁচু কহিল—ফিরে আয় মা!

পাঁচুর মা কহিল—দাঁড়া।

উত্তেজিত পাঁচু কহিল—না, ফিরে আয় বলছি।

পাঁচুর মা কহিল—চলনা তুই আমি যাই।

দৃঢ়ভাবে পাঁচু কহিল—মা এখুনি আয়, নইলে তোর সঙ্গে আমার শেষ!

পাঁচু আর অপেক্ষা করিল না, সে দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

পথের ওপাশেই রামকেষ্ট সাহার বাড়ী, বাড়ী হইতে রামকেষ্ট ডাকিল—পাঁচু!

পাঁচু চম্‌কিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—কে?

—আমি রামকেষ্ট।

পাঁচু বিরক্তভাবে কহিল—কি?

খোলা জানালা হইতে রামকেষ্ট কহিল—ধরতে পারলি নারে? কিছু আদায় হয়ে যেত। আর পারলি না দিতে বেটার ধুম্‌সো পিঠে গদাগদ ঘা কতক।

পাঁচু বিরক্ত ভাবেই কহিল—কি সব আবোল তাবোল ব'কছ তুমি?

হাসিয়া সাহা কহিল—অবোল-তাবোলই বটে রে, আবোল-তাবোলই বটে!—বাবা রামকেষ্টর কান খুট্ করলে সাড়া দেয়, চোরের দায়ে ঘুমোবার যো আছে? শালা বিপ্‌নে ঢুকলো তাও দেখেছি, পালালো তাও দেখেছি,—সব—আগা-গোড়া।

সাহা হাসিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপন পথ ধরিল।

পাঁচুর মা গিরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও গিরি বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়াইয়া।

পাঁচুর মা কহিল—বৌমা।

গিরি চমকিয়া উঠিল—তারপর পাঁচুর মায়ের পানে চাহিয়া সে কহিল—পাঁচুর মা! এত দেরী কি করে মা?

পাঁচুর মা স্থির দৃষ্টিতে গিরির পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা গিরির-দৃষ্টিতে আবার পড়িল সেই দ্রব্যসম্ভার, সে দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতেরো

এ সংসারে মানুষকে কঠোর সমালোচক বলিলে তাহার অতি প্রশংসা করা হয়—মানুষ নিন্দুক, পরনিন্দার উপর তাহার একটা সহজাত লিপ্সা আছে, সাদার গায়ে কালি ছিটাইয়া তাহার পরম তৃপ্তি।

প্রভাত হইতে না হইতে রামকেষ্ট-সংবাদ সমগ্র গ্রামের নর-নারীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। লোকে এখন দিনকতক জাবরকাটার উপযুক্ত খোরাক পাইয়া প্রবল উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া বসিল। রামকেষ্ট আসিয়া বিপিনকে ধরিল—মিষ্টি খাওয়াতে হবে দাদা। বিপিন উত্তর দিল না, শুধু সলজ্জা বধূটীর মত দন্ত বিচ্ছেদ করিয়া হাসিল মাত্র।

রামকেষ্ট কহিল—তুমি আমাকে এ কথা বল নি কেন? তা হ'লে কি ওই বাগ্দী বেটা জানতে পারে, না গাঁয়ে জানাজানি হয়? আমার জানলা থেকে নজর রাখলে কারু এড়িয়ে যাবার উপায়টি নাই বাবা—হুঁ হুঁ!

গভীর আত্মপ্রসাদের সহিত বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সে কথা শেষ করিল। বিপিন তবু কথা কহিল না, রামকেষ্ট কহিল—দাও ত খাইয়ে মিষ্টি তুমি, তারপর নির্ভয়ে চলে যেয়ো দিন দুপুরে, দেখবো কোন শালা কি বলে?—আর দেখ না তুমি ওই শালা বাগ্দীর কি করি।

বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তাই ত রামকেষ্ট, মিছি মিছি মেয়েটার কলঙ্ক হ'ল হে—কোন দোষের দোষী নয় হে বেচারী—

জিভের পাশে আর তালুতে সংযোগ করিয়া একটা বিচিত্র শব্দ করিয়া রামকেষ্ট কহিল—মাইরী আমার রসিক নাগর হে—ও নিন্দুখী হ্যাঁ নিন্দুখী, দুষী লোক আমরা;—কেমন? বলি শাক দিয়ে কি

মাছ ঢাকা যায়, না—কাঁচের আড়ে মানুষ লুকোয়? ও সব চলবে না, দাদা নগদ কিছু ছাড় এই গোটা বিশ পঁচিশ; আমরা মদ মাস খাই, আর তুমি—

বাকীটা বিপিনের কানে কানে বলিয়া এক তাণ্ডব হাসি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিপিনকে রাজী হইতে হইল। রামকেষ্ট মাটীর উপর একটা চড় কসিয়া উঠিতে উঠিতে কহিল—নিভ্যয় তুমি, বে-পরোয়া—যখন খুসী—

মৌন হইয়া বিপিন সম্মতি-লক্ষণ প্রকাশ করিল। রামকেষ্ট প্রবল উৎসাহে উঠিয়া কহিল—ওস্তাদকে একটী খবর দিতে হবে নাইরী; হরিলাল আমাদের হে!

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে না হইতে সারা গ্রামে সংবাদটা বিপুল কলরবে ধ্বনিয়া উঠিল। সে কলরবের প্রচণ্ডতায় গিরি—শ্রীমন্তের আগ্নেয়গিরি মূক, বিহ্বল হইয়া গেল।

সে মূক বিহ্বল হইয়া ভাবিতেছিল, আপন অদৃষ্টের কথা—হ্যাঁ তাহার অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতার চমৎকারিত্ব আছে। নিষ্ঠুরতার ক্রমবিকাশ কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই, সতেজ একটী লতার মত দিন দিন বাড়িয়া পাকে পাকে তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া চলিয়াছে, নাগপাশের মত, লোহার শৃঙ্খলের মত!

হায়, শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনের শেষ যদি এমনি করিয়া হইয়া যাইত, গিরি যেন জুড়াইয়া বাঁচিত!

একবার মনে হইল গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া মরিবে, কিম্বা বিষ—বিষপান করিয়া জুড়াইবে!

চট্ করিয়া উঠিয়া সে খিড়কীর ঘাটে গিয়া কল্কেফুলের গাছটা হইতে কয়টা ফল পাড়িয়া লইয়া দাওয়ায় আসিয়া ছেঁচিতে বসিল। হাতের পাথরটা উপরে তুলিতেই একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—সেই সেদিনের সেই মৃত্যু-অনুভূতির কথা—সহনাতীত সেই হিমানীশীতল স্পর্শ! সেই উদ্বেগ, সেই যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—যে যন্ত্রণার স্পর্শে সমস্ত চৈতন্য পঙ্গু হইয়া পড়ে—উঃ!

গিরি ফল কয়টা যথাশক্তি সজোরে প্রাচীর পার করিয়া বহু দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

পাঁচুর মা আসিয়া ডাকিল, বৌ মা!

গিরি উত্তর দিল না—তখনও সে মৃত্যুর ভয়ে যেন কাঁপিতেছিল।

পাঁচুর মা কহিল—রান্নাবান্না কর বৌমা! আজ চাল ডাল সব আমি দোকানে ধারে নিয়ে আসচি—কাল ভবি মোড়লের ধান আসবে, কিছু ধান দিয়ে শোধ করলেই হবে!

আবার সে চারিপাশ দেখিয়া কহিল—ওমা খড়কুটোও যে নাই, দাঁড়াও আমি নিয়ে আসি দু'টো—

গিরি অতি ব্যগ্রতায় বাধা দিয়া কহিল—এক কাজ কর ত পাঁচুর মা, খিড়কীর ওই কল্কেফুলের গাছটা কেটে ফেল। ওতে এখন বেশ ক'দিন রান্নাবান্না চলে যাবে।

—বেশ বলেছ মা তাই করব, পাঁচুকে বলব আমার, ওবেলা সে কেটে দিয়ে যাবে। আজ কালের মত আমি দেব এখন, এ দিকে গাছটাও শুকিয়ে থাকবে।

পাঁচুর মা চলিয়া গেল। কিন্তু গিরির দৃষ্টি বার বার ওই গাছটার দিকে ছুটিতেছিল। গিরি জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল, তবু বার বার ঐ দিকে দৃষ্টি যেন ফিরিয়া যায়।

ঠিক কে যেন ডাকে, মাতালের মনকে সুরা যেমন ডাকে।

গিরি অস্থির হইয়া উঠিল। সহসা ঘরের মধ্য হইতে কাটারীখানা বাহির করিয়া আনিয়া গাছটার গোড়ায় নিজেই সে আঘাত করিতে বসিল। আঘাতের পর আঘাত! সে আঘাতে ছোট গাছটা থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িল!

শীতের দিনেও বিপুল উত্তেজনায় ঘর্ম্মাক্তা গিরি বিচিত্র দৃষ্টিতে গাছটার পানে চাহিয়া রহিল।

বাড়ীর ভিতর কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। পরিচিত কণ্ঠস্বর, কিন্তু উত্তেজনার মধ্যে মানুষটাকে গিরি স্পষ্ট চিনিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া মানুষটাকে দেখিয়া যেন পাথর হইয়া গেল।

গিরির ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু হরিলাল সম্মুখের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে।

একদফা হাসিটা শেষ করিয়া হরিলাল কহিল—জীতা রহো ভাই,—জীতা রহো; বহুত আচ্ছা এহি তো চাহিয়ে।

উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া হরিলাল আবার কহিল—কেয়া ভাই, গরীব আদমী কেয়া কসুর কিয়া, আপকো পাশ? একঠো বাত তো বোল না চাহি—

গিরি এতক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল—কোন সাহসে তুমি আমার বাড়ীতে মাথা গলাও,—লজ্জা করে না তোমার—

হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—সীতারাম—সীতারাম, লজ্জাসরম তো হামারা নেহি হ্যায়—উ তো আওরৎ জেনানা কি চিজ; হাম মর্দ্দানা হ্যায়।—

আবার একচোট জোর হাসি হাসিয়া কহিল—আর সাহস?

আরে এ তো আমার শ্বশুরবাড়ী, শ্বশুরবাড়ী আসতে সাহস দরকার হয় নাকি ?

গিরি প্রবল উত্তেজনায় কহিল—বের হয়ে যাও বলছি আমার বাড়ী থেকে, এখুনি বের হয়ে যাও নইলে—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতখানা তুলিয়া উঠিল, সে হাতে তাহার কাটারী।

মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম মানুষ অনুমান করিয়া থাকে। উত্তেজনাদৃপ্তা খড়্গহস্তা মেয়েটাকে দেখিয়া হরিলাল ভয় পাইয়া গেল,—সে বুঝিল এ সর্ব্বনাশী এখন পারে সব।

হরিলাল পলাইল। কিন্তু দরজার মুখেই একবার ফিরিয়া দুই কলি গান সে গাহিয়া গেল, কহিল—একটা গান বেঁধেছি শোন সখি—

বিপিনে গোপন বিহার করেন আমার বি-পিন বি-হারী।

দ্বিতীয় কলি আর সে গাহিতে পাইলনা, গিরিও আর শুনিল না। বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী সংসার তাহার চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইতেছিল—অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

মানুষের মনের চেয়ে বড় শত্রু বোধ করি মানুষের আর নাই।

সর্ব্বান্তঃকরণে মানুষ যে-চিন্তা যে-কল্পনাকে সভয়ে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়, সেই চিন্তা সেই কল্পনাকে মন ডাকিয়া আনিয়া বসে।

বারবার মৃত্যুকে গিরির মন ডাকিয়া ডাকিয়া আনিতেছিল। ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—বিষ নে।

গিরি সভয়ে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বসে। বাহিরে রৌদ্র করোজ্জ্বল ফুলে ফলে মাধুর্য্যময়ী পৃথিবীর মধ্যে অনিবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল কোথায় কোথায় বিষের গাছ ফল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুক্ষণ পর পাঁচুর মা আসিয়া অবাক হইয়া গেল। সে কহিল—ওকি বৌমা, উনোনের কাঠকুঠো তেমনি পড়ে রয়েছে। এখনো রাঁধা বাড়া করনি ?

মানুষকে দেখিয়া মৃত্যু যেন পলাইল। গিরি পরম আশ্বাস পাইয়া কহিল—তুমি একটু ব'স পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে কহিল—বসব বলেই ত' এলাম মা। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া করনি যে ?

—এই যে করি। ভাবলাম বেলা একটু যাক দু'বেলার খাওয়া এক বেলাতেই সারব।

সে উঠিয়া উনান ধরাইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। পাঁচুর মা কহিল—কাল বুঝলাম বৌমা মোটা মোড়লের কথায় তুমি রেগে উঠতে কেন।

গিরি কাঁদিয়া ফেলিল। পাঁচুর মা নিজেই কহিল—কেঁদনা মা, কেঁদনা। যে যা বল্‌বে বলুক আমি ত' জানি বৌমা-সব। তাই ত' বল্লাম আমি পাঁচুকে আর পঞ্চায়েৎকে, যে নিষ্পাপ তাকে পাপী বল্লেই যখন অপরাধ হয় তখন তাকে আমি ছাড়ব কি ক'রে ?

গিরি মুখ তুলিয়া পাঁচুর মায়ের দিকে চাহিল। পাঁচুর মা আশ্বাস দিয়া কহিল—তুমি ভেবো না বৌমা, পাঁচুও যদি আমায় ছাড়ে, আমি তোমায় ছাড়ব না।

রাত্রে শুইবার সময় গিরি প্রশ্ন করিল—আচ্ছা পাঁচুর মা, মানুষকে মরণে ডাকে একি সত্যি ?

প্রশ্নটা না বুঝিয়া পাঁচুর-মা গিরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গিরি কহিল—লোকে যে বলে গলায় দড়ি নিতে গিয়ে যদি না মরে তবে মরণ দড়ি হাতে নিয়ে তাকে ডেকে বেড়ায়। বিষ খেতে গিয়ে না খেলে বিষ নিয়ে নাকি সে ডাকে।

পাঁচুর মা উত্তর দিল—হ্যাঁ মা ; মানুষের ও ইচ্ছে বড় মন্দ। ওতে-ও পাপ হয়। সত্যিই যে আত্মহত্যে করতে গিয়ে না মরতে পারে কি মরণ না হয়, মরণ তাকে ডাকে।

অন্ধকার শয্যায় গিরি উঠিয়া বসিল। পাঁচুর মা তাহা অনুভব করিয়া কহিল—উঠে বসলে যে বৌমা ?

—আমায় একটু দাঁড়াবে পাঁচুর মা ?

—কোথা ? এত রাত্রে কোথা যাবে ?

—এই খিড়কীর ঘাটে।

পাঁচুর মা আর কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই গিরি দরজা খুলিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘাটে আসিয়া গিরি কি একটা ভারী জিনিষ সশব্দে পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। আরও বিস্মিতা হইয়া পাঁচুর মা কহিল—কি বৌমা ?

—কাল বলব পাঁচুর মা।

ঘরে শুইয়া আবার কতক্ষণ পরে গিরি ডাকিল—পাঁচুর মা !

পাঁচুর মাও ঘুমায় নাই। সে তখনও ভাবিতেছিল সেই নিক্ষিপ্ত জিনিষটার কথা। সে উত্তর দিল—কি বলছ বৌমা ? ঘুম আসছে না ?

—আর একটু সরে এস না এ দিক দিয়ে। আমার বড় ভয় করছে।

—ভয় কি মা ? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, আমি জেগে রয়েছি।

আবার অল্প নীরবতার পর গিরি কহিল—তখন কি ফেল্লাম জান পাঁচুর মা ?

—কি ?

—দা'খানা।

পাঁচুর মা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গিরি কহিল—কি জানি কখন যদি গলায় দিয়ে বসি। মরণ যেন সত্যিই আমায় ডাকছে।

পাঁচুর মা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার একখানি হাত গিরির সর্ব্বাঙ্গে একটী নিবিড় স্নেহস্পর্শ মাখাইয়া দিল। নিজের অস্পৃশ্যতার অপরাধ সে ভুলিয়া গিয়াছিল। ভুলিয়া যাইবারই কথা। মানুষ যখন মনুষ্যত্বকে বুকের মধ্যে পায় তখন সে মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে মানুষের জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই; তখন সে কারও অপেক্ষা ছোট নয়, শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারও তা'র মধ্যে তখন থাকে না।

গিরিও আজ তাহার স্পর্শে সঙ্কোচ বোধ করিল না। স্নেহ-কাঙালী শিশুর মতই সে স্নেহস্পর্শ উপভোগ করিতেছিল। কতক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কথা বলিল।

—মরণে আমার আক্ষেপ কি বলত পাঁচুর মা? আমার বেহায়া মনকে সেই কথাই ত বার বার বলি। কিন্তু তার ভয় ঘোচে না,—তার আশা মেটে না। এখনও তার আশা হয়! ছি!

আবার সে কহিল—বেশী আশাও ত কোন দিন করি নি আমি। আশা ক'রেছিলাম নির্ঝঞ্ঝাট একখানি কুঁড়ে ঘর, স্বামী। সন্তান। সংসারের সব চেয়ে কুৎসিত একটী ছেলে যে শুধু মা ব'লে আমায় ডাকবে, হেসে কেঁদে আমার ঘর ভ'রে তুলবে। এও কি খুব বেশী পাঁচুর মা?

পাঁচুর মা কহিল—ভগবান কোকেও যদি তোমার একটী দিয়ে থাকেন বৌমা!

অশিক্ষিতা নারী এতক্ষণে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী সান্ত্বনা-বাণী আবিষ্কার করিয়াছিল বোধ হয়।

গিরি চমকিয়া উঠিল। তাই যদি হয়!

সঙ্গে সঙ্গে তার-পরের মুহূর্ত্ত-গুলি গিরির নিকট পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিল। একটী শিশু, তাহার রূপ। তাহার কথা সে-অন্ধকারের মধ্যেও পরিস্ফুটরূপে ভাসিয়া উঠিল।

চালের ফুটাটা দিয়া আজও তেমনি আকাশের তারা দেখা যাইতে-ছিল। সে রাত্রে গিরি কিন্তু তাহার কল্পনার শিশুটীকে স্বপ্ন দেখিল না;—দেখিল গৌরীকে।

আঠারো

দিন কয় পর।

জল খাইবার বেলায় পাঁচুর মা আসিয়া সংবাদ দিল আজ নাকি গ্রামে পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে। বিপিন দশের কাছে বেশ একটু সলজ্জ হাসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেকে গিরির সহিত জড়াইয়া দিয়াছে। সে কথা শুনিয়া গিরির আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। জীবনে এত বিস্ময় তাহার কোন দিন হয় নাই।

পাঁচুর মা অবশেষে কহিল—চন্দ্র সূর্য্য ত এখনও উঠছে বৌমা!

নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুষ্কচক্ষে গিরি পৃথিবীর চারিদিকে চাহিল। প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না। গিরির চক্ষেও বোধ হইল না। শীতশেষের তপ্ত উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন যেমন ছিল তেমনি রহিল। বাড়ীর পিছনে কোন একটা গাছের সেই দিনই বোধ হয় প্রথম ফুলটী ফুটিয়াছে। কাল ত এ মিষ্ট গন্ধটুকু পাওয়া যায় নাই!

উত্তর না পাইয়া পাঁচুর মাও চুপ করিয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিরি ধীরে ধীরে হাতের কাজটা আবার আরম্ভ করিল। তারপর একসময় সে কহিল—

তোমাদের পঞ্চায়েতও তোমাকে কি বলেছে নয় পাঁচুর মা! সেদিন বলছিলে।

স্বজাতির হৃদয়হীনতার লজ্জা যেন পাঁচুর মায়ের মাথায় চাপিয়া বসিল। অবনত মস্তকে মৃদুস্বরে সে বলিল—হ্যাঁ মা,—কাল ত বল্লাম তোমাকে।

গিরি শুধু বলিল—হুঁ।

পাঁচুর মা কহিল—আমিও ত তোমাকে বলেছি বৌমা—

বাধা দিয়া গিরি কহিল—না পাঁচুর মা, আমার জন্যে তুমিই বা দশজনকে ত্যাগ করবে কেন?

পাঁচুর মা বিরক্ত হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল—তোমার মেজাজ বড় খারাপ বৌমা। বিধাতার এত ঘা তুমি সইতে পারছ আর মানুষের দশটা কথা তোমার সহ্য হবে না!

গিরি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠেই সে কহিল—তাকে যে দেখতে পায় না পাঁচুর মা, নইলে জানোয়ারের মত টুঁটী কামড়ে ধরতো তার মানুষ। যাক্ তুমি যদি আমার মা হয়েই থাকবে তবে, এক কাজ কর। যাও দেখি ওগাঁয়ে ভবী মোড়লের ধানটা পাওয়া যাবে কি না দেখে এস।

পাঁচুর মায়ের ভয় হইতেছিল। সদ্য সদ্য এই বিশ্রী কথাগুলা রটনার পরই সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা সেই কথাই সে ভাবিতে-ছিল। সে ইতস্তত করিয়া কহিল—দু'দিন যাক না বৌমা।

গিরি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—যাও না মা। ফিরিয়ে দেয় দেবে। যে মিথ্যে কলঙ্ক আমার মানুষে রটালে সে কি মানুষ কখনও ভুলবে? মিথ্যেকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্য দিন দিন তার গায়ে রং চড়াবে। তার চেয়ে তুমি যাও যা হবার আজই হয়ে যাক। আজই ঠিক করে ফেলি এ গাঁয়ে থাকতে পাব কি না। না খেতে পেলে শুধু ত মানুষ পেটে কাপড় বেঁধে পড়ে থাকতে পারবে না।

গিরির কথাগুলার মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। পাঁচুর মা সে কথা লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে মরণের ভয়ে যে মানুষটা ঠিক আজিকার দিনটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সন্ধান পাইয়া

সেই মানুষটী এক মুহূর্ত্তে পাথরের মত কঠিন ও দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া?—পাঁচুর মা গামছাখানা মাথায় দিয়া বাহির হইতে হইতে সেই কথাই শুধু ভাবিতেছিল।

মেয়েটীর চরিত্রের অন্ত পাইল না সে।

গিরি ঘরখানিতে ঝাঁটা বুলানো শেষ করিয়া বালতীতে গোবরমাটী গুলিয়া মেঝে নিকাইতে আরম্ভ করিল।

কাজ করিতে করিতে অকস্মাৎ আপন মনেই সে কহিল—ভাল, মরব না আমি। দেখব, কে আমার কি করতে পারে!

বিপিনের এতখানি সাহসও ছিলনা, বুদ্ধিও খেলিত না। পঞ্চায়েতের তলবের পূর্ব্বে এটুকু জোগাইয়া দিল হরিলাল। কহিল—একটুখানি লজ্জার হাসি হেসে দিস দাদা, সব ঠিক হো যায়েগা।

বিপিন বিস্ফারিত নেত্রে হরিলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল—কিন্তু সে যে একেবারে মিথ্যে ওস্তাদ। আমার পাপে নির্দ্দোষ স্ত্রীলোককে—

হরিলাল তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না। ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—ছাড়ান দাও বাবা ধর্ম্মরাজ। যস্মিন দেশে যদাচার,—নেপালে মহিষ ভক্ষণ। এ বিয়ের এই আচার রে দাদা। ঠেলে ফেলে না দিলে ও ডুববার মেয়ে নয়।

বিপিন নখ দিয়া মাটী খুঁড়িতেছিল। কহিল—না—না না; তারপর সমাজে আমার কি হবে?

হরিলাল গান ধরিয়া দিল—পুরুষো পরশ-মণি। পুরুষকে পতিত করে কে কোন কালে রে!

হরিলালের বুদ্ধি ও সাহসে বিপিন কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কাজ হাসিল করিল। কিন্তু সেই কাষ্ঠ-হাসিটুকু হাসিতেই বেচারা ঘামিয়া সারা হইল।

হরিলাল আপন মনেই কহিল—এমন ছোটলোক পাপী আমি খুব কম দেখেছি। শালাদের পাপ করবার ইচ্ছে ষোল আনা, শুধু ভয়ে পারে না।

বিপিন আপন কৃতিত্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। আরও এতক্ষণে সে বুঝিয়াছিল—গিরি কেমন পাঁকে পড়িয়াছে। সে হরিলালের কাছে আসিয়া কহিল—ভারী ফন্দী ঠাউরেছিলে ওস্তাদ!

হরিলাল কহিল—ভাগ্।

সে চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরিয়া বিপিনকে ডাকিয়া কহিল—হামারা ইনাম। ইনাম তো মিল্না চাহি।

বিপিনও হিন্দী বাত ঝাড়িয়া দিল—জরুর। আজ কিন্তু রাতকো একঠো জল্সা হোনা চাহি। মালকোষ একঠো তুমারা পাশ শুন্নে হোগা ওস্তাদ।

হরিলাল কহিল—সব হোগা ভাই। হামারা রূপেয়া ঠো তো আগাড়ি মিল্না চাহি।

এদিকে তুমুল তর্কে পঞ্চায়েতের আলোচনা চলিয়াছিল। লুচী কি অন্নের ভোজন শাস্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে সেইটাই আলোচনার বিষয়। পঞ্চায়েত প্রেরিত হরেকৃষ্ণ তাহার ভগ্নী রতনকে সঙ্গে করিয়া গিরির নিকট কৈফিয়ৎ আনিতে গিয়াছে। গিরির মার্জ্জনা ভিক্ষা তাহাদের মারফৎ আসিলেই হয়।

পাঁচুর মা ভবী মোড়লের নিকট যাইবার জন্যই বাহির হইতেছিল। হরেকৃষ্ণ রতনকে সঙ্গে লইয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল—যাচ্ছ কোথা পাঁচুর মা!

পাঁচুর মা ইহাদের মতই কাহারও আগমন আশঙ্কা করিতেছিল। সে দাঁড়াইল। তারপর তাহাদের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—কেন?

—একবার ফের দেখি। শ্রীমন্তের পরিবারের কাছে একটু কাজ আছে।

পাঁচুর মা তাহার কঠিন দৃষ্টি তখনও অপসারিত করে নাই, সে ধীরে ধীরে কহিল—পঞ্চায়েৎ কত টাকা খেলে মোটা মোড়লের কাছ থেকে?

হরেকৃষ্ণের মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। হরেকৃষ্ণের ভগ্নী কিন্তু ভাইএর চেয়ে অনেক শক্ত। সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল—একটা বাগদীর মেয়েকে কিনবার ক্ষমতা যার নাই, সে টাকা খাওয়াবে সৎ জাতের পঞ্চায়েতকে? যা বৌকে গিয়ে বল আমরা এসেছি। না পথ আগ্‌লে কোঁদলই করবি?

জাতির হীনতার গালিটা পাঁচুর মা সহিতে পারিল না। সে অবনত হইয়া পড়িল।

গিরি তখনও ঘরের মেঝে নিকাইতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে সে প্রশ্ন করিল—কে গো পাঁচুর মা?

—আমি রতন ঠাকুর-ঝি। রতন অগ্রসর হইয়া গেল। পঞ্চায়েতের বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া সে কহিল—এখন এর কি বলছ বল।

গিরি ধীরভাবে রতনের কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইতেই সে আবার আপন কাজে মন দিল, কোন উত্তর দিল না। একটা অশোভন নীরবতার অস্বস্তিতে সকলেই যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

একটু প্রতীক্ষা করিয়া রতন কহিল—আমরা বলে ত' শুধু মুখদোষী ভাই। তা যা বলবে বল, আমরা গিয়ে বলে খালাস পাই।

সে কথারও কোন জবাব হইল না। দাম্ভিকা মেয়েটী আপন কাজই করিয়া যাইতেছিল। হরেকৃষ্ণ সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল—বলি ইয়ার্কী নাকি? কথা সব কানে যাচ্ছে না; না কি গো পাঁচুর মা?

পাঁচুর মাও নীরবে দাঁড়াইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্ষণেই সে একটা বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা করিতেছিল। সেও জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা!

গিরি মুখ তুলিল।

পাঁচুর মা সসঙ্কোচে কহিল—যা হয়—

গিরি কহিল—জবাব দিয়ে দিতে বলছ? জবাব আমি কিছু দেব না।

হরেকৃষ্ণ লাফাইয়া উঠিল। দুর্ব্বল ক্রোধে হাত পা ছুঁড়িয়া সে একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিল।

—কি রকম? জবাব দেবে না কি রকম? গাঁয়ে বাস কর তুমি কার হুকুমে?

পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব হইল—আমার নিজের হুকুমে।

—নিজের হুকুমে? আচ্ছা, আচ্ছা, দেখে নেব একবার নিজের হুকুম। গলায় ধরে যদি এখান থেকে বের করে না দিই তবে আমার নাম মিছে। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বের করে দেব।

গিরি রতনকে সম্বোধন করিয়া কহিল—ঠাকুর-ঝি তুমি তোমার ভাইএর চেয়ে বুদ্ধিমান। ভাইকে একটু বুঝিয়ে বল এমন করে হাত পা নেড়ে ত কোন ফল নেই। আমি যা বল্লাম পঞ্চায়েতকে গিয়ে তাই বল্লেই পারেন। আর বারবার যদি এমন ধারা আমার বাড়ী থেকে

আমাকে বের করে দেবার জন্যে মিথ্যে লাফালাফি করেন তবে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে হবে।

রতন বিবর্ণ-মুখে নীরব হইয়াই রহিল। সেও এমন প্রত্যাশা করে নাই। বলিয়ে-কহিয়ে বলিয়া গ্রামে তাহার একটা খ্যাতি ছিল।

হরেকৃষ্ণ কিন্তু তখনও থামে নাই।

গিরি পাঁচুর মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—পাঁচুর মা—ওদের বেরিয়ে যেতে বল আমার বাড়ী থেকে। না গেলে থানায় নালিশ করে আসব আমি।

এবার হরেকৃষ্ণ নির্ব্বাক হইয়া গেল।

রতন তাহাকে টানিয়া বাহির হইয়া গেল। তখনও পঞ্চায়েতের তুমুল তর্ক শেষ হয় নাই। হরেকৃষ্ণের আনীত সংবাদে সে তর্ক-সমারোহ একেবারে চুপ হইয়া গেল। গিরিকে অপাংক্তেয় করিয়া পঞ্চায়েৎ শেষ হইল।

গিরি পাঁচুর মাকে কহিল—যাও পাচুর মা তুমি যে কাজে যাচ্ছিলে যাও। ওদের কথা নিয়ে কচ্লালে পেট ভরবে না আমাদের।

ঘরের কাজটা শেষ হইয়া গিয়াছিল। গিরি বারান্দায় দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের উপর একটা অর্থহীন দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। তারপর অকস্মাৎ সে কহিল—শেষ অগ্নিপরীক্ষাই দিয়ে যাব পঞ্চায়েৎকে। সে আগুনে দেখব গ্রাম পোড়ে কি না! যদি না পোড়ে বুঝব বিধাতাই আমার কপালে আগুন দিয়েছে। নইলে সব মানুষের চালাকী।

*

* *

উনিশ

জেলখানার বড় ফটকটায় প্রবেশ করিতে শ্রীমন্তের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল ; জানোয়ারের পিঁজ্‌রার মত গরাদে-ঘেরা রক্তবর্ণ বিশাল লৌহদ্বার ভিতরে বাহিরে খাকীর উর্দ্দিপরা ভীমকায় প্রহরী—কাঁধে হিমশীতল লৌহময় মরণাস্ত্র, অভ্যন্তরে তার অগ্নিগর্ভ সুপ্ত মৃত্যু, সারাটা বুক বেড়িয়া লোহার মোটা শিকলে মোটা মোটা চাবীর গোছা। অবিরাম রুক্ষ শাসন করিয়া করিয়া মানুষের কোমল রক্তমাংসের মুখও বিভীষণ ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখের পানে দৃষ্টিমাত্রেই বুকের রক্ত চমকিয়া উঠে।

পিছনের লৌহদ্বারটা তাহাকে গ্রাস করিয়া বন্ধ হইয়া গেল, যেন একটা রাক্ষস আহার গিলিয়া বিরাট মুখটা বন্ধ করিল।

লোহার গরাদের ফাঁকে ফাঁকে এখনও বিশাল পৃথিবীর মুক্ত শ্যামাঞ্চল-খানির অংশ দেখা যাইতেছে, মাত্র কয় পদ ব্যবধান ; কিন্তু এই কয় পদ ভূমি অতিক্রম করিতে তাহার লাগিবে দীর্ঘ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর! শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, চোখে জলও আসিয়াছিল কিন্তু সে জল মাটিতে ফেলিতে তাহার সাহস হইল না ; সান্ত্বনার, মমতার স্পর্শ না পাইলে দুঃখ মূক হইয়া যায়, আত্মপ্রকাশ করিতে তারও ভয় হয়।

শ্রীমন্তের ধারণা ছিল তাহার ওই গ্রামখানির মত নিষ্করুণ মমতাহীন ক্ষেত্র বুঝি দুনিয়ায় আর নাই—কিন্তু মৃত্যুর মত স্তব্ধ হিমশীতল এই পাষাণ-পথ, প্রতি পদক্ষেপে যে স্থান সুকঠোর প্রতিধ্বনিতে গর্জ্জন করিয়া উত্তর দেয়, চোখের জলে যে স্থান গলে না—তার চেয়ে আপন ছায়ানিবিড় কোমল মৃত্তিকাময়ী গ্রামখানি ঢের ঢের মমতাময়ী।

কিন্তু ভিতরে গিয়া সে কেবল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল নয়,—আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

দুর্দ্দান্ত মানুষের মেলা—হাসি, খেলা, গান তাহাদের অফুরন্ত।

শ্রীমন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এমন কেমন করিয়া হয়!

কিছু দিন যাইতে যাইতে সে বুঝিল—হয় এমন হয়,—দুঃখের চেয়ে মানুষের প্রাণের শক্তি অনেক বড়,—দুঃখ দূর হইতেই অসহ্য ভয়াবহ কিন্তু তাহাকে যখন মাথায় করিতে হয় তখন সে লঘুভার হইয়া যায়, তাচ্ছিল্যের সহিত তাহাকে বহন করা যায়;—প্রাণ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, দুঃখের চাপে সে মরে না।

এতদিনে জেলখানাটা তাহার মন্দ লাগিল না—

বেশ,—উদরের চিন্তা করিতে হয় না, পাওনাদারের তাগিদ নাই—দিনগত পাপক্ষয়—ঘানির চারিপাশে ঘুরিলেই খালাস।

দশ সের সরিষায় চৌদ্দ পোয়া তেল, বসিয়া বসিয়া তার দিনের হিসাব কর।

কষ্ট কি নাই?

আছে বৈকি—লোহার ঘানিটার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে সারাটা দেহ যেন পাথরের মত জমিয়া কঠিন হইয়া আসে, স্নায়ু শিরা যেন ছিঁড়িয়া যায়—রক্ত মাংসের মানুষ পাথর হইয়া পড়ে। কিন্তু কষ্টকে তুচ্ছ করাই ত পুরুষের পৌরুষ! আর পাথর হইলেই বা ক্ষতি কি?

সেই ত ভাল, নির্য্যাতন লজ্জা পাইবে।

কিন্তু বুকের ভিতরটা যে পাথর হয় না;—নিত্য রজনীতে গিরি যেন ওই লোহার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়, অশ্রুমুখী বিশীর্ণা গিরি—!

শ্রীমন্তের বুক ফাটিয়া যায়।

বুকের ভিতরটা ধড়্‌ফড় করিয়া উঠে, শ্রীমন্ত উঠিয়া বসিয়া কত অন্তহীন ভাবনা ভাবে—গিরিও হয়ত এমনি করিয়া জাগিয়া বসিয়া রাত্রির অন্ধকারে চোখের জল শেষ করিয়া রাখিতেছে;—দিনে ত তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিবে না,—উদরান্নের চেষ্টায় হা হা করিয়া বেড়াইতে হইবে!

কাজ না পাইলে—হয় তো বা ভিক্ষা।

শ্রীমন্ত আর ভাবিতে পারে না,—সে চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় পাশের লোকটাকে ডাকিয়া কহে—শশী, শশী, ও শশী!

ঘুমন্ত শশী উত্তর দেয় না—সে পাশ ফিরিয়া শোয়।

শশীর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মধ্যে চেতনার ক্ষীণ আভাষ পাইয়া শ্রীমন্ত কহে—তোর মার্কার হিসেব দেখতে বল্‌ছিলি না সন্ধ্যেয়!

শশী কহে—হুঁ।

—জেল তোর কত দিন,—ছ মাস ত?

—হুঁ।

—খাটা হল কত দিন?

—হুঁ।

শ্রীমন্ত তাকে ঠেলা দিয়া কহে—হুঁ কি রে, খাটা হল কত দিন তাই বল, না—হুঁ!

ঘুমঘোরের মধ্যেও বুঝি মুক্তির ব্যগ্রতা বন্দী ভুলিতে পারে না, শশী জড়িত কণ্ঠে কহে—দেখ কেন হিসেব করে। চার মাস বিশ দিন হ'ল।

শ্রীমন্ত কহে—তবে ত আর মেরে দিয়েছিস্ রে! তিন ছয় আঠারো দিন বাদ গেলে থাকে তোর পাঁচ মাস বারো দিন, আর ধর গিয়ে তোর বছরের দোসরা মাসের দরুণ বাদ যাবে দু' দিন—এই তোর হ'ল গিয়ে দশ দিন—পাঁচ মাস দশ দিন—এই তোর চার মাস বিশ দিন—রাত

পোয়ালেই একুশ দিন তা হ'লে আর আছে তোর না, ন' দিন আর ন' দিন আঠারো দিন,—দশ দিনের দিন তো খালাসই পাবি।

শশী কহে—ক'দিন বল্লি—ক'দিন ?

—আঠারো দিন।

—না. আরও একদিন কমবে, খালাসের দিন রবিবার পড়েছে—শনিবার দিন খালাস দেবে।

শ্রীমন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকে—বাহিরে গভীর নিস্তব্ধ অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে—সমস্ত ধরণী যেন ব্যথায় মূর্চ্ছিতা, আর ওই কালো অন্ধকার যেন তার আহত বুকের নীল কাঁচা রক্ত! মানুষের আপন অন্তরের প্রতিবিম্ব এমনি করিয়াই নির্জ্জন মুহূর্ত্তে তাহার চোখের উপর বহিপ্রর্কৃতির বুকে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীমন্ত আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহে—শশী, আমার একটি কাজ করবি ভাই ?

শশীর আবার তন্দ্রা আসিতেছে। সে তন্দ্রাঘোরেই কহিল—উঁ।

—আমার একটি কাজ করবি ?

—হুঁ।

—তোকে ত গোকুল-মাটী হয়ে বাড়ী যেতে হবে, তা তুই যদি নদীটা পার হয়ে আমাদের গাঁ হয়ে একবার যাস্,—

—হুঁ।

—আমাদের বাড়ীতে যদি আমার খবরটা দিয়ে যাস্ ভাই,—

—হুঁ।

—আর আমাকে একখানা চিঠি দিতে বলবি।

শশীর আর সাড়া পাওয়া যায় না, তন্দ্রা বোধ করি ভার হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীমন্তের তাহাতে বিশেষ আসে যায় না—সে

আপন মনেই বলে—তোর যত্ন কেমন করবে সে দেখবি, গুরুর আদর করবে। সে বেলা তোকে যেতে দেবে মনে করেছিস্—না খাইয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

শশীর তখন নাক ডাকিতেছে, কিন্তু স্মৃতি-স্মরণে ত অপরের সাহচর্য্যের প্রয়োজন হয় না, বরং নির্জ্জনতাই সে স্মৃতিগাথাকে গাঢ় উপভোগ্য করিয়া তোলে ; ওই প্রগাঢ় অন্ধকারের মাঝেও গিরির ম্লান মূর্ত্তি শ্রীমন্তের চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত হইয়া জাগিয়া উঠে। এই জাগ্রত স্বপ্নে শ্রীমন্ত অধীর হইয়া উঠে—সে ভাবে কেন, কেন, দেহের মত বুকটাও পাষাণ হয় না কেন ?

আবার প্রভাত হইতে কাজ কাজ কাজ, কাজকর্ম্মের ব্যাপৃতিতে সময় কাটিয়া যায় ; বেলা দশটায় যেই আসিয়া হাঁকে—সোলেমান—আপিসে যাও চিঠি আছে তোমার।

আমার—?

আমার ?

আমার ?

চারিদিক হইতে পাষাণ-দেহের মধ্যে কোমল মানুষ আত্মপ্রকাশ করিয়া মমতাকরুণ স্বরে প্রিয়জনের বার্ত্তার জন্য জিজ্ঞাসা করে আমার ? আমার ? অথচ ওরা বেশ জানে যে বার্ত্তা নাই—বার্ত্তা !

শ্রীমন্তও জিজ্ঞাসা করে ; মেট আপন পথে চলিতে চলিতে সমবেত-প্রশ্নের জবাব দিয়া যায়—না, না, না !

দুয়ারের শাস্ত্রীরা কঠোর ভাবে শাসন-বাণী গর্জ্জন করে—এই চালাও চালাও—সব কাম চালাও।

কিন্তু 'কাম' যে চলে না, পাথরের মত শক্ত দেহ অবশ হইয়া আসে যে !

সেদিন সকাল বেলায় হুকুম আসিল—শ্রীমন্তকে বদল করা হইয়াছে, তাহাকে যাইতে হইবে অপর জেলে।

সম্বন্ধহীন দুর্দ্দান্ত পর, তবু তারা শ্রীমন্তকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে, কত জন কত গোপন সংবাদ বলিয়া দেয়,—অমুকের সঙ্গে দেখা করিস্ অমুক আছে সেখানে; অমুক মেটের সঙ্গে বুঝে চলিস্, শালা এক নম্বরের বদমাস। তবে কালো-পাগড়ীটা লোক ভাল, আমার নাম করিস্।

শ্রীমন্ত শশীকে ডাকিয়া কহিল, তোর ত ভাই আর তিন চার দিন আছে, দেখিস ভাই আমার বাড়ী হয়ে যাস্, আমার খবরটা দিবি আর একখানি চিঠি আমাকে দিতে বলবি।

শশী কহিল—কোন ভাবনা করোনা দাদা, আমি নিশ্চয় বলে যাব। আমি যাব ধর চারদিনের দিন, ধর তোমার সাত দিনের দিন নিট তুমি চিঠি পাবে।

আবার নতুন স্থান নতুন সাথী সহচর, কিন্তু নামেই নতুন, সেই সব, সেই নির্ম্মম নীরস পাষাণ-আবেষ্টনী, সেই নির্ম্মম কঠোর সান্ত্রীর দল, সেই দুর্দ্দান্ত বন্দী সহচর সব, সেই কর্ম্ম-ধারা, সেই জীবন-ধারা, এতটুকু এদিক-ওদিক নাই শুধু মুখ চিনিতে সময় লাগে।

একদিন পথে কাটিয়াছে, তার পর দিন যায়, আর শ্রীমন্ত দিন গণিয়া যায়—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—সাত।

সকাল বেলা হইতেই সেদিন শ্রীমন্তের বুকটা কেমন করে—

বেলা দশটার সময় সেই আসিয়া হাঁকিল—জাফর সেখ, হাবল বাগ্দী, চিঠি আছে, আপিসে—

শ্রীমন্তের কণ্ঠধ্বনিতে সকলে চমকিয়া উঠিল, মেট আর যাইতে যাইতে উত্তর দিতে পারিল না, সে ফিরিয়া শ্রীমন্তের মুখ পানে চাহিয়া কহিল,—কই আর কারু ত চিঠি নাই।

শ্রীমন্ত বুকে ঘানির ডাণ্ডাটা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া গেল,—শাস্ত্রী তাড়া দেয়, কিন্তু শ্রীমন্ত তবু দাঁড়াইয়া থাকে।

সিপাহীটা আসিয়া পিঠে পেটীর একটা আঘাত করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দিল।

শ্রীমন্ত বারেক চমকিয়া সিপাহীটার পানে একটা হিংস্র দৃষ্টি হানিয়া আবার ঘানি টানিতে লাগিল। টানিতে টানিতে আপন মনেই সে মৃদু গুঞ্জনে গান ধরিল—

"মন তুমি কার, কেবা তোমার,
এ দুনিয়া ভোজের বাজী।"

দুনিয়া হয় তো সত্যই ভোজের বাজী কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তার সৃষ্টির মধ্যে ওই ভোজবাজীরই ক্রীড়াপুত্তলী। ওই বাজীর ভেল্কী এড়াইয়া তাহার চলিবার উপায় নাই, তাই কেউ কাহারও নয় জানিয়াও পরের জন্য মানুষকে ভাবিতে হয়—সে ভাবনার দ্বার ত রোধ করিবার উপায় নাই, চিরদিন অনাহূতই সে আসে—ললাটে নয়নপ্রান্তে গোধূলির আকাশের মত একটী বিষণ্ণ ছায়া ফেলিয়া আবার এই ভাবনাই মানুষের জীবনের পাথেয়, এ নহিলে মানুষ বাঁচে না।

শ্রীমন্তও ভাবিল, সারাটা রাত্রি কত সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তাহার প্রিয়ার চিন্তার ধ্যানে ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত দিল।

শশী হয়ত যায় নাই, সংবাদ দেয় নাই।—

আবার চিঠি লিখিতে পয়সাও ত চাই!

গিরি হয়ত বাড়ীতেই নাই,—অভাবের তাড়নায় দেশ বিদেশে কোথাও দাসীবৃত্তি করিতেছে!

আবার মনে হয় গিরি হয়তো বাঁচিয়াই নাই অভিমানিনী গিরি সে হয়তো গলায় দড়ি দিয়া সর্ব্ব জ্বালা যন্ত্রণা এড়াইয়া চলিয়া গেছে।

বিপিনের ধান হয় তো অভাবের জ্বালায় ভাঙিয়া খাইয়াছে,—বিপিন কটুকাটব্য করিয়াছে; হরিহরের মা সেই দুইটা টাকার জন্য কত কথাই বলিয়াছে; হয়তো বা হরিলাল আসিয়া কত নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছে। আর অভিমানিনী গিরি এমনি এক অন্ধকার রাত্রে ঘরের মধ্যে গলায় দড়ি দিয়া কোন অজ্ঞাত মরণপথে পলাইয়া বাঁচিয়াছে। হু হু করিয়া শ্রীমন্তের চোখ দিয়া অশ্রু নামিয়া আসিল। কতক্ষণ চলিয়া গেল—সহসা শ্রীমন্তের মনে হইল হয়তো বা ফটকে তাহার চিঠি চাপিয়া রাখিয়াছে, শাস্তি দিবার জন্য ত অগণ্য পন্থা ইহাদের, হয়তো উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে শ্রীমন্ত ঘোষকে চিঠি পত্র না দেওয়া হয়!

আচ্ছা কাল দেখা যাইবে, একদিন দেরী হওয়া আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু কাল তাহার পত্র আসিবেই।

দশটায় মেট আসিয়া হাঁকিয়া গেল—হরেকৃষ্ণ ডোম, জলিল সেখ, মহবুব আলি—পত্র আছে।

শ্রীমন্ত আজ আর জিজ্ঞাসা করিল না—আমার?

সে ঘানির ডাণ্ডাটা ছাড়িয়া দিয়া বাহিরের পানে চলিল। দুয়ারের সিপাহীটা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—আরে তু কাঁহা যাতা? শালা ঘানি উলটু দিয়া—

শ্রীমন্ত ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া আবার চলিল। সিপাহীটা এবার ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার জামা ধরিয়া কহিল—চিঠ্যি চিঠ্যি,

তোমকো কৌন দেগা?

শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া কহিল, আমার পরিবার আছে ঘরে।

সিপাহী তাহাকে পেটা করিয়া কহিল—পরিবার আছে, পরিবার আছে, তুমকো লাগিয়ে বসিয়ে আসে উ;—উ ভাগা কিধার কোইকো সাথ—

শ্রীমন্ত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল, সে বাঘের মত সিপাহীটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, ঘুঁসি কিল চাপড়ে তাহার মুখখানা রক্তাক্ত করিয়া দিল।

তার পর—?

পিঁজরায় বন্দী বাঘের পালাইবার ত পথ নাই, সে যত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে তত তাহার বন্ধন দৃঢ় হয়।

শ্রীমন্তেরও হইল, এই অপরাধের জন্য আবার বিচার হইল, জেলের বিচারে তাহার রেমিশন কাটা গেল, আদালতের বিচারে আর দুই বৎসর হাজৎ তাহার বাড়িয়া গেল।

বিচারশেষের দিন সাজা লইয়া শ্রীমন্ত জেলে ফিরিল একটা নিষ্ঠুর হাসি হাসিতে হাসিতে।

আবার কত দিন চলিযা গেল, আবার সে চিঠির জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, এবার সঙ্গীরা পরামর্শ দিল—এক কাজ কর তুই, দরখাস্ত কর তুই যে আমার বাড়ীর খবর আনিয়ে দেওয়া হোক।

—দেবে?

—আলবৎ দেবে?

শ্রীমন্তের সে সাহস হইতেছিল না,—সংবাদের নামে তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠে—!

জীবনের এতটুকু আশা—কত সুখস্বপ্ন সে দেখায়,—সেটুকু মুছিয়া গেলে বাঁচিবে সে কি লইয়া?

কিন্তু—তবু—।

কুড়ি

আরও দিন বিশেক পর।

একটা আলস্যে, ক্লান্তিতে গিরি ক্রমশঃ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। জয়ের নেশা মানুষের জীবনে বোধ হয় জন্মের সঙ্গে সহজাত। আর এই নেশাই জীবনে আবহমানকাল হইতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এই নেশা যেখানে যত প্রবল পৃথিবীর ইতিহাস সেখানে তত বিচিত্র, মহিমময়। দ্বন্দ্বের কাহিনীই ত পৃথিবীর ইতিহাস। আলেকজেণ্ডারের দিগ্বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসের একটা উজ্জ্বলতম অধ্যায়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তিতে পরাজিতের আত্ম-সমর্পণ ত বিষণ্ণ অবসাদেই ভরা, জেতার উল্লাসের উগ্রতা ও দ্বন্দ্বের সমাপ্তিতে অবসন্নই হইয়া উঠে।

কিছুদিন পরেই পঞ্চায়েত যেন অবসন্ন হইয়া পরাজয়ই মানিয়া লইল। দ্বন্দ্বের যেটুকু ক্ষীণ রেশ লাগিয়া রহিল তাহা গিরিকে মাতাইয়া তুলিতে পারিল না। গিরিকে তাহারা অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়া দিল। গিরি সে গ্রাহ্যই করিল না।

পাঁচুর মা কহিল—লোকে ত' দিয়ে-থুয়েই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

গিরি মাটীতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিল। সে পাঁচুর মায়ের কথার কোন জবাব দিল না।

দেহ কেমন অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। দ্বন্দ্বের উত্তেজনার অন্তরালে জীবনের যত কিছু ব্যর্থতা, শূন্যতা সব যেন ঢাকা পড়িয়া ছিল। আজ সে দ্বন্দ্বের অবসানে, উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া আসিতেই সেই সব দুঃখ গ্লানি আবার তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। শরীরও

তাহার বেশ ভাল বোধ হইতেছিল না। ক্লান্তিতে দেহ আর বয় না। তন্দ্রালসতায় সর্ব্বদাই শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সেই সর্ব্বনাশী আবার তাহাকে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নির্জ্জন নিঃসঙ্গ অবসরে সে তাহাকে ডাকে—কখনও স্মরণ করাইয়া দেয়—কোথায় বিষ-ফলের গাছ ; কোথায় দড়ি . কোথায় গঙ্গা ; গভীর জলতল কেমন শীতল !

সেদিন আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছিল। প্রভাত পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখেই ঢেঁকিশালের চালাটার ওপাশে তালগাছের মাথা-গুলি দেখা যাইতেছিল। বড় দেবদারু গাছটায় নূতন কচি পাতা দেখা দিয়াছে। তাহারই ডালে বসিয়া হলুদ রঙের অতি সুন্দর পাখীটা শিষ দিয়া ডাকিতেছিল—কৃষ্ণের পোকা হোক।

গিরি সেই ডাক শুনিতে শুনিতে কহিল—মিছেই ডেকে মরিস তুই। কৃষ্ণের পোকা কোন কালে হ'ল না ; হবেও না।

পাঁচুর মা কহিল—না বৌমা, ওরা ত ও বলে না। বলে গেরস্থের খোকা হোক।

ঈষৎ হাসিয়া গিরি বলিল—একই কথা মা। ওর অভিশাপও ফলে না ; আশীর্ব্বাদেও কিছু হয় না।

—তা হয় ত হয় না বৌমা। কিন্তু আশীর্ব্বাদও ত' করে। মিষ্টি কথাও ত বলে। তাই বা সংসারে ক'জন বলে !

—তা বটে।

পাঁচুর মা কহিল—আবার সেদিন একজন বৈরেগী বাবাজী বলছিল ওরা নাকি এ সব কিছু বলে না। ওরা বলে 'কৃষ্ণ কোথা হে !'

গিরি কহিল—যা মনে করবে, তাই শুনবে তুমি ওর ডাকে।

ঝির ঝির করিয়া খানিকটা বাতাস বহিয়া গেল। গিরির নিজের হাতে পোতা করবী গাছটা সে-বাতাসে লুটোপুটী খাইয়া দুলিয়া উঠিল।

গিরি গাছটার দিকে চাহিয়া কহিল—করবী গাছটায় এক কলসী জল দিয়ো ত' পাঁচুর মা।

পাঁচুর মায়ের একটা কথা যেন মনে পড়িয়া গেল। সে কহিল—তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছি বৌমা। তোমার গাছে এবার কুঁড়ি ধরেছে দেখেছ।

অতি-মাত্রায় গিরি উল্লসিত হইয়া উঠিল। গাছটীর ডালগুলি সযত্নে নোয়াইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল—আমার তা হ'লে নাতনী হবে পাঁচুর মা।

পাঁচুর মা বিস্মিত হইয়া গেল। গিরি কহিল—আমার নিজের হাতে পোতা গাছ—ও আমার মেয়ের মত। ওর ফুল হবে—সে আমার নাতনী হবে না?

পাঁচুর মা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কাজ করিয়া চলিল। এই ব্যথাতুর নীরব সহানুভূতি গিরিকে স্পর্শ করিল। সে ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—যার যেমন অদৃষ্ট পাঁচুব মা।

অ-দৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা চলে না। পাঁচুর মা চুপ করিয়াই রহিল।

গিরি কহিল—গাছটাকে সাধ খাওয়াতে হবে পাচুর মা! খুব ঘটা ক'রে করব আমি।

পাচুর মা এতক্ষণে হাসিল।

সমস্ত দিনটা গিরির মনে মনে একটা পুলক জাগিয়া রহিল। পাঁচুর মা কার্য্যান্তরে বাহিরে গেল। গিরি করবী গাছটীর নিকটে বসিয়া সস্নেহে গাছটীর শাখাপ্রশাখায় মায়ের মতই হাত বুলাইয়া কত আদর করিল। কত ছড়া সে গুন্ গুন্ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গেল। গৌরী এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এ গান আর সে গায় নাই।

অপরাহ্ন বেলায় মাথার উপরের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। দিগন্ত রেখার কোলে কোলে শুধু ছিন্ন বিশৃঙ্খল কালো মেঘের স্তর। সে স্তরমালার সর্ব্বাঙ্গ অস্তমান রক্তবর্ণ সূর্য্যের কিরণ-প্রভায় গভীর রক্তবর্ণে ঝলমল করিতেছিল। আরও উপরের মেঘে মেঘে ক্রমশঃ ক্ষীণ রক্তাভার সমারোহ। আকাশে রক্ত সন্ধ্যা দেখা দিয়াছিল। তাহার প্রতিচ্ছটায় সমস্ত পৃথিবী রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম বসন্তের উতলা পাখীর দল এমন উপভোগ্য সন্ধ্যায় বিচিত্র কলরবে চারিদিক মুখর করিয়া তুলিযাছিল।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে গিরি কলসীটা তুলিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখ দুর্দ্দশা জীবনে তাহার জন্মগত ব্যাধি। তাহার জন্য লজ্জা বা আক্ষেপ গিরির কোন দিন ছিল না। কিন্তু স্বামীর হঠকারিতার কর্ম্মফলে যেদিন গ্রামশুদ্ধ লোক কানাকানি করিয়া হাসিল—সেই দিন হইতে আপনার মন্দ ভাগ্যের লজ্জায় গিরি মুখ লুকাইয়া ছিল। ঘাটে পথে সে বড় বাহির হইত না। এই মন্দ ভাগ্যের লজ্জারও উপরে ছিল পাওনাদারের তাগিদের ভয়। কিন্তু যেদিন পঞ্চায়েতের দরবারে তাহার কলঙ্কের কৈফিয়ৎ-তলবের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিল, সেই দিন হইতে সে আবার পথে ঘাটে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে যেন বিদ্রোহের অবনমিত ধ্বজা দশের রক্তচক্ষুর সমক্ষে ডঙ্কা বাজাইয়া বহন করিয়া চলে।

যাক এত কথা। গ্রামের প্রান্তে বেনেপুকুর। গ্রাম অতিক্রম করিয়া গিরি মুক্ত মাঠে নামিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে যেন রঙের সায়েরে ডুব দিয়া উঠিল। কাপড়খানাকে কে যেন লাল রঙে ছোপাইয়া দিয়াছে। অনাবৃত প্রত্যঙ্গগুলি অপরূপ বর্ণশোভায় সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তিলের সাদা ফুলগুলি আজ যেন রাঙা হইয়া ফুটিয়াছে। পায়ের তলায়

সবুজ ঘাসের রং যে সে কি দাঁড়াইয়াছে—তাহা গিরি জানে না। গিরির চিত্ত বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

ঘাটে কেহ ছিল না। বেনেপুকুরের স্থির কালো জলের তলে রাঙা আকাশ ধরা দিয়াছে। গিরি চঞ্চলা বালিকার মত আলোড়ন তুলিয়া জলে নামিল। জলতলের রাঙা আকাশে ঢেউ উঠিল। পুকুরের পাড়ে সজিনা গাছে ফুলের ফুলঝুরি দেখা দিয়াছে। সে ফুলের ছবিগুলিও দুলিতেছিল। গিরি গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া সেই ছবি দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে তরঙ্গিত জল স্থির হইয়া আসিল। স্থির জলতলে রাঙা আকাশের পটভূমির উপর ফুটিয়া উঠিল—বড় সুন্দর একখানি মুখ। আপনার মুখশ্রীতে গিরি আপনি মুগ্ধ হইয়া গেল। চোখের কোলে কোলে দুঃখের কাল রেখাটী রূপ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। সে যেন কাজলের রেখা। জল হইতে হাত দুইখানি তুলিয়া গিরি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তারপব দেহখানি তুলিয়া অঙ্গবাস মুক্ত করিয়া আপন দেহের পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ সে যেন চমকিয়া উঠিল।

তাহার দেহের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে সুরু করিয়াছে। কে যেন তাহার দেহশ্রী ভাঙিয়া গড়িতে সুরু করিয়াছে।

লজ্জায়—আনন্দে গিরির চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। সে আপনার স্তনদু'টী নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিল। শ্যামশোভা সম্পন্ন স্তনাগ্র দু'টী ফলন্ত শস্যশীর্ষের মত ঈষৎ অবনমিত। সে তাড়াতাড়ি ভিজা কাপড়খানি ভাল করিয়া দেহে জড়াইয়া পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে বাড়ী ফিরিল।

কাপড় ছাড়িয়া সে কেরোসিনের ডিবাটী জ্বালাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিল। ডিবার রক্তাভ ক্ষীণ রশ্মিতে ভাল করিয়া কিছু দেখা যায় না। সলিতাটা গিরি অসম্ভব রকম বাড়াইয়া দিল।

সে আলোতে সে দেখিল—সত্যই তাহার রূপ অপূর্ব্ব নবরূপে আকার লইতেছে। তাহার রক্ত মাংসের দেহ লইয়া কোন অজ্ঞাত শিল্পী অদৃশ্য হস্তে যেন দেবতার শ্রীমন্দির গড়িয়া তুলিতেছে। আপনার রূপ দেখিয়া গিরির নিজেরই আশা মিটিতেছিল না।

তাহার তন্ময়তা ভাঙ্গিল পাঁচুর মায়ের ব্যগ্র কণ্ঠের আহ্বানে। রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া পাঁচুর মা ডাকিতেছিল—বৌমা! বৌমা!

সে অসম্বৃত বসনে দরজা খুলিয়া দিল।

পাঁচুর মা কহিল—ঘরে এত ধোঁয়া কেন বৌমা? আমার যে ভয় হয়েছিল! ওমা—ডিবেটা জ্বলছে যেন মশাল জ্বলছে।

গিরি পাঁচুর মায়ের হাত ধরিয়া কহিল—দেখত পাঁচুর মা, দেখত।—

—কি বৌমা?

গিরি প্রদীপ্ত জ্বলন্ত ডিবাটী আপনার অনাবৃত দেহের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

কহিল—কিছু বুঝতে পারছ না?

পাঁচুর মা একাগ্র দৃষ্টিতে গিরির দেহের দিকে চাহিয়া ছিল।

গিরির যেন বিলম্ব সহিতেছিল না। সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বুঝতে পারছ? একি সত্যি?

পাঁচুর মা সস্নেহে গিরির স্খলিত বসনাঞ্চল তাহার দেহে টানিয়া দিল। বলিল—ভর-সন্ধ্যে বেলা, গায়ে কাপড় দাও মা। খোলা গায়ে থাকতে নাই।

গিরির তবু সন্দেহ যায় নাই। সে বলিল—কিছু বোঝা গেল না পাঁচুর মা।

স্নেহভরেই পাঁচুর মা কহিল—বেশ ত বোঝা যাচ্ছে বৌমা! তোমার খোকা হবে।

গিরি বোধ করি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে নত হইয়া পাঁচুর মাকে প্রণাম করিতে গেল। তাড়াতাড়ি পিছাইয়া গিয়া পাঁচুর মা কহিল—ছি-ছি-ছি ও-কি করছ বৌমা? আমাকে পাপে ডোবাচ্ছ কেন?

হাসিয়া গিরি বলিল—কোন পাপ হবে না মা। তুমি আমার মায়ের মত।

পাঁচুর মা কহিল—এমনি আশীর্ব্বাদ করছি আমি বৌমা। কিন্তু আমি যে ছোট জাত।

জাত! গিরি সেই বাঁকা হাসি হাসিল।

ছেঁড়া কাপড়ের রঙীন পাড় হইতে সুতা বাহির করা হইতেছিল। কাঁথার উপর নক্সা তোলা হইবে। পাঁচুর মা উঠানে একরাশ ধান লইয়া বসিয়া ছিল।

লাল সুতার গোছায় পাক দিতে দিতে গিরি কহিল—সবজে সুতো শুধু হল না পাঁচুর মা। সবজে সুতো ভিন্নও ত লতা কি বোঁটা তোলা হবে না।

পাঁচুর মা কহিল—এক নেচী সবুজ কস্তা হাট থেকে নিয়ে এলেই হবে।

রতন হরেকৃষ্ণের ভগ্নী আসিয়া দাওয়ায় বসিল। অনাবশ্যক ভাবেই কৈফিয়ৎ দিয়া কহিল—দিন ভাই অনেকটা বড় হয়েছে। বসে বসে ব্যাজার হয়ে উঠল মন। তাই বলি যাই বৌ কি করছে একবার দেখে আসি।

গিরি ছোট্ট একটী সম্ভাষণ করিল—এসো।

পাঁচুর মা কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিয়া ফেলিল—খাঁথ-কাটা করাত দেখেছ বৌমা, আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

রতন কথাটা গায়ে মাখিল না। সে গিরির হাতের কাজের দিকে চাহিয়া কহিল—ও কি হবে বৌ?

সংক্ষেপে গিরি কহিল—কাঁথা।

—কাঁথা!—কেউ বরাত দিয়েছে বুঝি?

—না।

—তবে কার? এযে দেখছি ছোট ছেলের কাঁথা তৈরী হচ্ছে!

গিরি কথা কহিল না। উত্তর দিল পাঁচুর মা। কহিল—বৌমা আমাদের পোয়াতী।

রতন সবিস্ময়ে গিরির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর পরম উৎকণ্ঠার সহিতই যেন সে কহিল—এ তুই সামলাবি কি করে বৌ?

মৃদুস্বরের এই কয়টী কথা নিঃশঙ্ক মেয়ে দুইটীর কানে বাজের মতই গর্জ্জন করিয়া উঠিল। গিরির হাত হইতে সুতার নেঠীটা অকস্মাৎ মাটীতে পড়িয়া গেল। পঙ্গুর মত নিশ্চল মূর্ত্তিতে নিঃশব্দে সে রতনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পাঁচুর মায়েরও হাতের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বহুক্ষণ এমনি নীরবতার পর প্রথমে কথা কহিল পাঁচুর মা। ভ্রুকুটী করিয়া সে কহিল। এ কথার মানে কি হ'ল শুনি?

চিবাইয়া চিবাইয়া রতন কহিল—মানে যা হয় তাই। সে ত তুইও বুঝেছিস, বৌও বুঝেছে।

—বুঝেছি। কিন্তু ধম্ম ত' আছে, এখনও ত চন্দ-সূর্য্য উঠছে।

—তাই ধম্মকেই ডাকিস, সে-ই সাক্ষী দিয়ে যাবে। রতন উঠিয়া পড়িল।

পাঁচুর মা কহিল—ধম্ম সাক্ষী দেয় না তা জানি। সে কারো সাক্ষীই দিতে আসে না। শ্রীমন্তের বৌএরও না;—তোমারও না; বিশ্ব সংসারে কারও না।

এতক্ষণে গিরি ধীরে ধীরে কহিল—যাক্ পাঁচুর মা মিছিমিছি ঝগড়া ক'র না। চেঁচামেচি আমি ভালবাসি না। তুমিও যাও রতন ঠাকুরঝি। সাক্ষী আমি কাউকে মানব না। আর সামলাব কেমন ক'রে তাও না হয় শুনে যাও। আমার ছেলে আমি বুকে করে সামলে রাথব।

পাঁচুর মায়ের ঝগড়ার কথায় রতন পিছায় নাই। কিন্তু গিরির শান্ত অথচ দৃঢ় উত্তরে সে ভড়কাইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া বসিল অবশেষে কহিল—যাই বিপিন দাদাকে ধরি গিয়ে—সন্দেশ খাওয়াক।

এক মুহূর্ত্তের জন্য গিরির চোখ দুইটা ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই সে শান্ত হইয়া মুখ নামাইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ধৈর্য্যের বাঁধ আর তাহার থাকিতেছিল না। রতন বাহির হইয়া যাইতেই সে কহিল—দোরটা দিয়ে দাও ত পাঁচুর মা।

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। বুক চাপড়াইয়া তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ভবিষ্যতের বাস্তবতা তাহার চক্ষের উপর ভয়াবহ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিল।

তাহার মাতৃমন্দিরের শিশু-দেবতার অঙ্গে বর্ব্বর মানুষগুলা নরকের কাদা ছিটাইয়া কর্দ্দমাক্ত বীভৎস করিয়া তুলিল!

আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে কূলহারার মত ডুবিয়া গেল।

বহুক্ষণ পর সে একটা সংকল্প লইয়া উঠিয়া বসিল। পাঁচুর মা বাহিরে নীরবে বসিয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া গিরি কহিল—পাঁচুর মা তুমি বাড়ী যাও।

পাঁচুর মা চমকিয়া উঠিল কহিল—কেন?

—আর তোমাকে দরকার হবে না পাঁচুর মা।

—এ-কথা কেন বলছ বৌমা? কি করবে তুমি আমায় সত্যি করে বল।

তাহার কণ্ঠস্বরের উদ্বেগে গিরি ব্যথিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সে তুমি নাই শুনলে পাঁচুর মা।

দৃঢ়কণ্ঠে পাঁচুর মা কহিল—তা হ'লে আমি যাবনা বৌমা।

ধীরে ধীরে গিরি কহিল—আমি বিপিন মোড়লকেই ডাকতে পাঠাব, পাঁচুর মা।

এ কথার পর পাঁচুর মা আর রহিল না। সে যাইবার সময় বলিয়া গেল—ধর্ম্মটা রাখতে পারলেই ভাল করতে বৌমা। ভগবান যে কোন দিক দিয়ে দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে দুঃখ দেন তা ত দেখলে।

গিরি এ কথার উত্তরে শুধু হাসিল মাত্র—তাহার স্বভাব-অভ্যস্ত বাঁকা হাসি।

নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আলোকে আলোময় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া ঘরের পর ঘরের চালের উপর উর্দ্ধমুখী লেলিহান আগুনের শিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

বিপুল আর্ত্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশের ক্রোল পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিতেছে···জল! জল! জল!—

হে ভগবান রক্ষা কর!—ঠাকুর রক্ষা কর!

শেষ ফাল্গুনের শুকনা খড়ের চাল অগ্নির অতি উপাদেয় হইয়া আছে। শীতের অন্তে অগ্নিরও জড়ত্ব ঘুচিয়াছে। চঞ্চল কিশোরের মত আগুন যেন নাচিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল।

গ্রামপ্রান্তে স্বল্পস্রোতা নদীটা পার হইয়া সরকারী পাকা সড়কটা

চলিয়া গিয়াছে। নদীর ওপারের ঘাটে সেই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গিরি নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে এই অগ্নিলীলা দেখিতেছিল। তাহার দু'টী অধর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফুটিয়াছিল নিঃশব্দ নিষ্ঠুর হাসি!

কিছুক্ষণ পর গ্রামের দিকে পিছন ফিরিয়া শুভ্র রাস্তাটীর চিহ্ন-পথে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিল। পথের দূরত্বের হিসাব ছিল না। হিসাব রাখিবার প্রয়োজনও নাই। ঘরের বন্ধন, সমাজের নাগপাশ নিজের হাতে আগুন ধরাইয়া সুনিঃশেষে ভস্ম করিয়া পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া আপনাকে সে মুক্ত অনুভব করিল।

রাত্রির অন্ধকার পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। আকাশ ক্রমশঃ রক্তরাঙা হইয়া উঠিল। তারপর সেই রাঙা দিগ্বলয় ভেদ করিয়া উদিত হইল অতি সুকোমল রক্তবর্ণ প্রভাত-সূর্য্য!

সে অরুণোদয়কে গিরি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

একুশ

দীর্ঘ চার বৎসর পর এমনি আর একটী অন্ধকার রাত্রে গিরি ওই ঘাটের ওপরে বসিয়া ছিল। এতদিন পরে গিরি বাহিরের দুনিয়াকে যাচাই করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ আকাশ। সম্মুখে দুকূলস্ফীতা নদী মাঝে মাঝে আবর্ত্তের শব্দ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। গিরি বাধ্য হইয়া ঘাটের মাথার বটগাছটার তলে আশ্রয় লইয়াছিল। পাশে ময়লা একটা কাপড়ের ওপর ঘুমন্ত একটী শিশু —গিরির সন্তান।

ঝিপ্ ঝিপ করিয়া মৃদুবর্ষণ আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তপক্ষ পাখীর পাখার ঝাপটের মত আর্দ্র বায়ু উতলা হইয়া উঠিল। শীতে ছেলেটা নড়িয়া চড়িয়া গুটীসুটী হইয়া শুইল। গিরি ডাকিল—নীল! নীল!

ছেলেটীর নাম রাখিয়াছে নীলকণ্ঠ।

গিরির জীবন-মন্থনে যত কিছু বিষ উঠিয়াছে ওই তাহা নিঃশেষে পান করিয়া আসিয়াছে। যেদিন ও আসিয়াছিল সেদিনের কথা গিরির মনে পড়েনা। দুঃখ দুর্দ্দশাময় জীবনের ইতিহাসের মধ্যে হইতে এ দিনটী তাহার হারাইয়া গেছে। শুধু মনে পড়ে সেদিনও এমনি একটী বর্ষণ-মুখর অন্ধকার রাত্রি। একটা ছোট সহরের প্রান্তদেশে গাছতলায় প্রকাণ্ড একটা পুরানো বয়লারের মধ্যে গিরি আশ্রয় লইয়াছিল।

প্রসবের যন্ত্রণায় গিরির চক্ষের সম্মুখ হইতে আকাশ, অন্ধকার, অরণ্য সব যেন মুছিয়া গিয়াছিল। তারপর যে মুহূর্ত্তগুলি আসিল সে তাহার চেতনার সম্মুখে একটা অস্বচ্ছ যবনিকার আড়াল দিয়া গিরির

চেতনা হইলে দেখিল সে একটা হাঁসপাতালে। কোলের কাছে নীলকণ্ঠ।

থাক্; গিরি স্মৃতিকে ভুলিতে চাহিতেছিল। স্মৃতির পীড়ন তাহার সহ্য হইতেছিল না। আর্দ্র বাতাসে শীতার্ত্ত হইয়া গিরি ছেঁড়া কাপড়টা গায়ে ভাল করিয়া টানিয়া দিতে চেষ্টা করিল। শতছিন্ন সিক্ত কাপড়-খানায় শীত কাটে না। দুই হাত দিয়া গিরি আপনার পঞ্জর দু'টা আঁকড়াইয়া ধরিল।

হাড়! শুধু হাড়—কঙ্কালের মালা! দুরন্ত বীভৎস ব্যাধি জলৌকার মত ধীরে ধীরে রক্ত মাংস সব হরণ করিয়া লইয়াছে।

গিরির তাহাতে আক্ষেপ নাই। তাহার চিত্ত যেন প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। কেন আক্ষেপ নাই? এই আক্ষেপই জীবনের আজ সব চেয়ে বড় আক্ষেপ! কেন তাহার দেহ গেল? এই বর্ব্বর পৃথিবীতে সে বাঁচিয়া থাকিবে কি লইয়া? একটা দিনের কথা মনে পড়িল।

বড়লোকের দেবালয়ে সে আশ্রয় লইয়াছিল। দেবালয়; অতিথিশালা; উৎসব আড়ম্বরের অভাব নাই সেখানে। বাড়ীর দুয়ারে নীলকণ্ঠকে কোলে করিয়া বসিয়াছিল দুই মুঠা উচ্ছিষ্টের আশায়! দেবালয়ের কর্ত্রী পূজার তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—কে লা তুই?

সসঙ্কোচে গিরি উত্তর দিল—ভিখেরী মা!

—এমন গতর কাজ করিসনে কেন? কাজ করবি?

গিরি বর্ত্তাইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—কেন করবোনা মা।—পাইনে কাজ—

বেশ আমাদের এই ঠাকুরবাড়ীতে কাজ কর। এঁটো কাটা ঘুচোবি। তুই আর তোর ছেলে খেতে পাবি, মাইনেও কিছু পাবি।

গিরি এই দেবালয়ের বিগ্রহের পায়ে সেদিন অসীম ভক্তিভরে অসংখ্য প্রণতি জানাইয়াছিল। ঈশ্বর সত্যসত্যই সেদিন তাহার নিকটে দয়াল ঠাকুর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অসীম ভক্তি; ত্রুটীহীন নিষ্ঠার সহিত সে দেবালয়ের সেবায় আপনাকে নিয়োগ করিল। দিন পনেরো পর বোধহয়!—নীলকণ্ঠের জ্বর হইয়াছিল। অসুস্থ শিশুকে শোয়াইয়া প্রভাতের কাজ সে কোন মতে সারিল। কিন্তু অসুস্থ ছেলেটার ক্রমশঃ যেন অসুখ বাড়িতেছিল। গিরি ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

দ্বিপ্রহরে ভোগের কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া গেল। গিরি নীলকণ্ঠকে কোলে করিয়া ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইল।

রূঢ় কণ্ঠে কর্ত্রীর আদেশ হইল—ঠাকুর, ওমাগীকে ভাত দিয়োনা আজ। কাজ না করলে ভাত পড়ে থাকেনা দুনিয়ায়।

গিরি ছেলেটাকে একটু ছায়ায় শোয়াইয়া দিল। তার পর ঝাঁটা গাছটা হাতে করিয়া উচ্ছিষ্ট স্থান মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

আবার তেমনি রূঢ় কণ্ঠে আদেশ হইল—ঝাঁটা রেখে দাও তুমি। তোমার কাজ করতে হবে না।

গিরি ঝাটাগাছটা ফেলিয়া দিল। তার পর ধীর কণ্ঠে সে কহিল—

এ ক'দিনের মাইনেটা আমার দিয়ে দিন মা।

—মাইনে দেব না।

গিরি আর কথা কহিল না। সে ছেলেটাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভিতরে তখন ঠাকুর ব্রাহ্মণ বলিতেছিল—ওর ছেলের অসুখ মা।

সে কথার কেহ কোন জবাব দিল না। ব্রাহ্মণটী আবার কহিল—

ওকে আজকের মত দু'টো এঁটো ভাত—।

এ কথার জবাব আসিল—না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা গিরির চোখের উপর যেন ঘুরিতেছিল। সে পথের ধারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথ বহিয়া লোক যায় আসে। গিরি মৃদুকণ্ঠে কহে, বাবু!

পথিক ফিরিয়া চায়। শুধু ফিরিয়া চায় নয়, দৃষ্টি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার লেহন করিয়া যায়। তারপর চলিয়া যায়। কেহ কিছু দিয়াও যায়—একটা পয়সা, একটা আধলা।

একটী ভদ্রলোকের ছেলে ভিক্ষা দিতে পকেটে হাত দিল। বাহির হইল একটা টাকা। সে বারবার টাকাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া পকেটে পুরিল। আবার কিছুক্ষণ পর সে লোকটী ফিরিল। গিরির কাছাকাছি আসিয়া টাকাটা বাহির করিয়া শব্দ পরীক্ষা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গিরি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুনিয়ায় পশুত্ব আর তাহাকে বিচলিত করে না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। গিরি হাতের পয়সা গণনা করিয়া দেখিল সাড়ে তিন পয়সা হইয়াছে। দুইটা পয়সা তিনটা আধলা। ঘৃণাভরে সে পয়সা কয়টা পথের অন্ধকারে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। একটা বাঁধা ঘাটে গিয়া কয় আঁজলা জল খাইয়া সে বসিয়া রহিল।

পয়সা কয়টা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য ক্রমশঃ তাহার মনে অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। সে উঠিয়া পথের সেই স্থানটা হাত দিয়া খুঁজিতেছিল। হাতে ঠেকিল শুধু একটা আধলা। ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া আসিল।

ঘাটে শুইয়া সে আপনার কথাই ভাবিতেছিল। জীবনের কথা মনে করিয়া রাত্রি কাটাইতে গেলে তাহার সহস্র রজনী প্রভাত হইয়া যায়। নীলকণ্ঠ ঘুমাইয়াছে।

—এই।

শব্দে চমকিয়া গিরি দেখিল ঠাকুরবাড়ীর সেই ব্রাহ্মণ। হাতে একটা পাতায় খাদ্য লইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

ঠাকুর কহিল, নে খা।

গিরির অন্তর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ওই অন্ন তাহার মুখে তুলিতে রুচি হইল না। কহিল—না।

ঠাকুর তাহার মনের কথা বুঝিয়াছিল। সে পাতাটা নামাইয়া দিয়া কহিল—

ঠাকুর বাড়ীর ভাত নয়। কিনে আনলাম।

গিরির চোখে জল আসিল। পাতার খাবারে হাত দিতেই হাতে ঠেকিল একটা কঠিন বস্তু। অন্ধকারেও রৌপ্যের রূপ লুকাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর। কে আসিয়া ঘাটে নামিল। গুন্ গুন্ করিয়া লোকটা গান গাহিতেছিল। গিরি পঙ্গুর মত অসাড় দেহে পড়িয়াছিল। কোন দিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

তাহার সে চমক ভাঙিল ঠন করিয়া একটা মৃদু শব্দে।

লোকটা জলে পা ধুইতে ধুইতে টাকাটা বাঁধাঘাটের উপর আছড়াইতেছিল। আর আপন মনেই বলিতেছিল—

না—শব্দ ত' ঠিক আছে!

এই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে গিরি যেন অনুভব করিল সমস্ত অতীতটা তাহার মিথ্যা হইয়া গেছে।

তার পর?

তার পর কত মানুষকেই সে দেখিল। অধিকাংশই তাহার পাষণ্ড

নৃশংস। মোটর ড্রাইভার সেই লোকটা! কালো ধূলিধূসর চেহারা, জবাফুলের মত লাল চোখ।

সে বর্ব্বরটাকে তাহার হত্যা করা উচিত ছিল।

নীলকণ্ঠকে সে টুটী টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ছায়াছবির মত তাহারই পদচিহ্নিত ধরিত্রীর অংশগুলি চোখের উপর তাহার ভাসিয়া চলিয়াছে।

অকস্মাৎ গিরি অস্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। জলের ধারাগুলি অসহ তীক্ষ্ণ হইয়া মুখে চোখে বিঁধিতেছিল। কিন্তু সেদিকে তাহার গ্রাহ্যই ছিল না।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিতেছিল—আয় আয়।

এ সেই!—যে একদিন হিমশীতল অঙ্গুলী তাহার ললাটের সম্মুখে ধরিয়াছিল। গিরি সভয়ে সরিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার গৃহকোণ হইতে যে একদিন তাহাকে ডাকিয়াছিল, বিষ নে! সে তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পরও জীবনে অকস্মাৎ কতদিন আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেই আজ আবার দেখা দিয়াছিল।

গিরি দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। কোথাও কিছু দেখা যায় না। এ বিপুল অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আজ মিথ্যা হইয়া গেছে। শুধু পদতলে দুকূলস্ফীতা আবর্ত্তময়ী নদী অন্ধকারের মধ্যে চক্ চক্ করিতেছিল। ওই নদীর মধ্য হইতে ডাক উঠিতেছিল। গিরি এক দৃষ্টে নদীর বুকের দিকে চাহিয়া রহিল। মন্থর পদে জলের দিকে সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

অকস্মাৎ ওপারে কোথায় সশব্দে নদীর কূল ভাঙিল। সেই শব্দে চমকিয়া উঠিয়া গিরি বোধ করি আত্মস্থা হইয়া উঠিল। সে ডাকিল—নীল।

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবার চেষ্টাও করিল। যেমন তেমন চেষ্টা নয় ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পিচ্ছিল তটভূমিতেই সেই অদৃশ্য শত্রু বসিয়া ছিল। সে গিরির দুর্ব্বল কম্পিত পদ ধরিয়া আকর্ষণ করিল। গিরি পদস্খলিতা হইয়া নদীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল।

বাইশ

এই কয় বৎসরে এপারের গ্রাম খানার মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বিপিন নাই, পাঁচুর মাও মরিয়াছে। আরও কতলোক গিয়াছে। কত নতুন মানুষের মেলা। শ্রীমন্তের ঘরখানা একটা মাটির স্তূপে পরিণত হইয়াছে। চিহ্নের মধ্যে বাঁচিয়া আছে একটা করবীর ঝাড়, আর তাহারই সমরেখায় ওদিকে সেই লেবু গাছটা। বাস্তু-ঘরের মাটীর উর্ব্বরতায় গাছ দুইটা ঘন বর্ণে সতেজ স্বাস্থ্যে বিস্তৃত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঋতুতে ঋতুতে পুষ্পসম্ভারে অপরূপ শ্রী ধরিয়া উঠে তাহারা। বর্ষার নিশীথ রাত্রে লেবু ফুলের উগ্র গন্ধে সুরভিতবর্ষণসিক্ত বায়ু চারিদিকে তাহার বার্ত্তা বহিয়া বেড়ায়। করবী গাছটা রক্তরাঙা ফুলে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া বাতাসে দোলে। তাহারও ফুলে ফুলে একটী মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ উঠে। মানুষের সুখ দুঃখের কোন ছায়াই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই।

গ্রামের লোকে বলে এই গাছ দুইটার তলে নিশীথ রাত্রে কাহাকে নাকি দেখা যায়। শীর্ণা এক নারী অতি দুঃখে যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া গেছে। কোলে তাহার অর্দ্ধ-দগ্ধ একটী শিশু। মধ্যে মধ্যে সে নাকি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে। লোকে তাই ওদিক দিয়া মাড়ায় না। গাছের ফুল গাছে ফুটিয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। লেবু গাছটায় ফল পাকিয়া রসভারে মাটীতে পড়িয়া মাটীতেই মিশাইয়া যায়। বীজ হইতে অসংখ্য চারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে! কতক তাহার পশুতে নষ্ট করে, কতক শুকাইয়া যায় উত্তাপে!

শুধু একটা ছেলে মাঝে মাঝে ওখানে যায় আসে। পাকা লেবু সংগ্রহ করিয়া এখানে ওখানে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই বয়সেই ব্যবসা শিখিয়াছে ও। উলঙ্গ ধূলিমাখা দুনিয়ার হেলায় হেলায় বর্দ্ধিত শিশু আপনার উদরান্নের সংস্থান আপনি করে। গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়। পাখীর মত আশীর্ব্বাদের বুলি আওড়ায়। সমস্ত শব্দ গুলার অর্থও হয়ত সে জানে না।

গৃহস্থের দুয়ারে গিয়া ডাকে—অনাথকে দয়া কর গো মা। কল্যাণ হবে মা।

কল্যাণ মানে হয় তো শিশু জানে না। অনাথ যে কি সে ধারণাও তাহার নাই।

সব দিন আশীর্ব্বাদে গৃহস্থের হৃদয় গলে না। রূঢ়বাক্যে তাহাকে খেদাইয়া দেয়। তার জন্যও কোন অভিযোগ নাই কোন দুঃখ নাই তার।

সে তখন ব্যবসায়ী সাজিয়া বসে। ছেঁড়া গায়ের কাপড়ের আঁচল হইতে লেবু বাহির করিয়া বলে—লেবু লেবে গো? লেবু?

তাহাতেও দয়া না হইলে, গৃহস্থকে ভেঙাইয়া পলাইয়া যায়। অন্তরালে গালিও দেয়।

আবার দশ দিন বিশ দিন গ্রাম গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। দশ দিন বিশ দিনের অদর্শনে বিন্দু বিন্দু করিয়া করুণা গৃহস্থের বুকে জমিয়া থাকিবে এ জ্ঞানটুকু তাহার হইয়াছে।

কত নূতন গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে—কে রে তুই?

ছেলেটা উত্তর দেয়—আমি গো নীলকণ্ঠে!

—নীলকণ্ঠে! কাদের ছেলে রে?

—সেই ক্ষেপীর ছেলে গো আমি। হুই গাঁয়ের সেই ক্ষেপী গো। মা কোথা চলে গিয়েছে আমাকে ফেলে। ভিক্ষে করি গো আমি।

—আহা-হা থাকিস কোথা রে ?

—গাঁয়ে গাছতলাতে পড়ে থাকি।

ধরিত্রী জননীর নিজের হাতে মানুষ করা সন্তান ও। এই পরিচয় ছাড়া অপর পরিচয় সব তাহার মুছিয়া গেছে। ও বসুমতীর সন্তান, জীব, মানুষ !

সংসারে এইটাই বোধ হয়,—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই সব চেয়ে সত্য সব চেয়ে বড় পরিচয়। আদিম মানব এই পরিচয় লইয়াই সংসারে আসিয়াছিল। কিন্তু মানুষ সংসারে যে দিন মালিক হইয়া উঠিল সেই দিন সে নিজেকে করিল প্রধান। স্রষ্টা ক্ষেত্র সব মুছিয়া দিয়া আপনাকে আদি করিয়া মানবের ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বাঁধিয়া দিল। তাই আজ আপনার পরিচয়ের পূর্ব্বে আর একটা মানুষকে খাড়া করিতে না পারিলে মানুষের সমাজে তার ইতিহাস কলঙ্কিত—সে হয় অপাংক্তেয়।

গৃহস্থ সাবধান হইয়া কহে—সরে দাঁড়া রে সরে দাঁড়া না বাপু। ছোঁয়া পড়বে যে। যত অজাত কুজাত কি এই খানেই আসবে রে বাপু !

নীলকণ্ঠ রাগে না। শুধু ও নয় এ সংসারে নীলকণ্ঠের দলই রাগে না।

ছেলেটা নির্ব্বিকার ভাবে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—যাও মা যাও।

ও গাঁয়ের ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা সেদিন ঝাঁটা লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। তাহাতেও ওর বিকার নাই। দূরে দাঁড়াইয়া বিধবাকে সে ভেংচী কাটিয়া কহিল—দাঁড়া দাঁড়া দেব এক দিন ভাতের হাড়ি ছুঁয়ে।

কেহ করুণা করিলে সে করুণার সুবিধা পথের শিশু সুচতুর ভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে।

তাহার দুঃখের ইতিহাসে কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলে, নীলকণ্ঠ কোমলকণ্ঠে কহে—চারটী মুড়ী দেবে গো ? জল খাব।

জল খাবার মিলিলে ও বেশ মিষ্ট করিয়া বলে—একখানা ছেঁড়া কাপড় দেবে মা? আর একটা পয়সা? এই দিন লেবু এনে দোব তোমাকে। পাকা পাকা লেবু!

কোমরে আবার একটা গেঁজ্‌লে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে থাকে দুই চারিটা পয়সা—ও সঞ্চিত সম্বল।

নীলকণ্ঠের সঙ্গীও একজন মাঝে মাঝে মেলে। বেঁকা বুড়ী তার নাম। তা'র মাথাটা গলার উপর থরথর করিয়া অবিরাম কাঁপে। লোল হাত পা গুলাও কাঁপে। বুক পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়া গেছে। কম্পনত্রস্ত অপটু হাতে এক গাছা লাঠী ধরিয়া বুড়ী গ্রাম গ্রামান্তরে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। ভিক্ষার পথে নীলকণ্ঠের সঙ্গে দেখা হয়। কত অন্ধকার সন্ধ্যায়, কত বাদল দিনের পিছল পথে নীলকণ্ঠ বুড়ীর হাত ধরিয়া বুড়ীর বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়। পথে চলিতে চলিতে বুড়ীকে ফেলিয়া দিবার ভাণ করে। বুড়ী গাল দেয়—মর-মর। মরবি রে খালভরা মরবি। রক্তের তেজ চিরদিন থাকেনা।

নীলকণ্ঠ কৌতুকে খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসে।

আবার পাঁচ দিন যদি বুড়ীর দেখা না পায় তবে একদিন বুড়ীর বাড়ী গিয়া খোঁজ করে—বেঁকা-বুড়ী আছিস না মরেছিস?

বুড়ী ঘাড় কাঁপাইতে কাঁপাইতে কহে—কে কে রে নীলে? আয় আয়। বড় জ্বর রে।

—কি খেলি?

—কি খাব? ভিখ না করলে,—তা তুই যদি—

নীলকণ্ঠ আর শোনে না। নির্ব্বিকার চিত্তে অনির্দ্দিষ্ট পথ বহিয়া চলিতে আরম্ভ করে। যাইবার সময় বুড়ীকে গালি দিয়া যায়—ভাগ্‌ বেটী তেমুণ্ডে বুড়ী, মর্‌ না তুই!

কিন্তু ফিরিবার সময় ছেঁড়া আঁচল হইতে কতকগুলা মুড়ী ঢালিয়া দিয়া যায়। কোন দিন বা একটী পয়সা ফেলিয়া দিয়া যায়। কহে—মুড়ী কিনে খাস।

কত দিন আবার বুড়ীর সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে মনের কথা হয়।

নীলকণ্ঠ বলে—আচ্ছা বুড়ী, বড়লোকগুলো যদি মরে যায় তো কি মজা হয় বল তো?

বুড়ীর মাথায় আসে না তাহাতে কি এমন মজা হইতে পারে। সে শিহরিয়া বলে—ও সব বলতে নাই, শুনতে পেলে ওরা মারবে।

—মারবে? ছিঃ—শুন্‌চে কে তাই মারবে?

ধনীর প্রতি ঘৃণা,—ধনের উপর লোভ এই শিশুর বুকে কে দিল? সর্পের মুখে বিষ যে দেয় সেই কি?

এমনি সময়ে বৈশাখের এক খর প্রভাতে—রৌদ্র তখন সবে প্রখর হইয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে, এক আগন্তুক আসিয়া শ্রীমন্তের ধ্বংসাবশেষ ভিটাটীর পাশে উপস্থিত হইল। স্থানটাকে যেন সে চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটীর মাথায় একরাশ চুল। অর্দ্ধেক তাহার পাকিয়া গেছে। মুখে দীর্ঘ দাড়ী গোঁফ। দেহ খানার কাঠামো দেখিয়া মনে হয় এককালে সে দেহ পাথরের মত দৃঢ় ছিল। কিন্তু আজ তাহা শিথিল হইয়া যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। মুখে চোখে এবং সর্ব্ব দেহ ব্যাপিয়া একটা শ্রান্তির চিহ্ন। সে যেন বিশ্রাম চায়।

সে শ্রীমন্ত।

ভিটাটীকে সে চিনিল ওই গাছ দু'টীর চিহ্ন দেখিয়া। কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। আপন ভিটার জন্য, গিরির জন্য অশ্রু তাহার সঞ্চয় করা ছিল। গিরির মৃত্যুসংবাদ গিরির মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত পাইয়াছিল। জেলে থাকিতেই সে বাড়ীর সংবাদের জন্য

কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিল। জেলের নিয়মানুযায়ী জেলের কর্ত্তা সংবাদ দিলেন শ্রীমন্তের বাড়ী যে থানার এলাকাভুক্ত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে। থানার কর্ম্মচারীই সংবাদ দিয়াছিল—

শ্রীমন্তের স্ত্রী গিরিবালা পুড়িয়া মরিয়াছে।

সে আগুনে তাহার ঘর, ও পরে সমস্ত গ্রাম পুড়িয়াছে।

আঘাতটা শ্রীমন্তকে বড় বাজিয়াছিল। সে আঘাতের বেদনা ভুলিবার নয়।

জেল হইতে বাহির হইয়াই গিরিমাটী কিনিয়া সে কাপড় রাঙাইয়া ফেলিল। একবার মনে হইয়াছিল গৌরী মাকে তাহার দেখিয়া আসে। গৌরীর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াও সে ফিরিয়া আসিয়াছে। দেখা করিতে লজ্জা হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়াছে সে ভাল আছে। তাহার শনি ছাড়িয়াছে—হরিলাল মরিয়াছে। দূর হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াই সে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পদার্পণ করিল আপন ভিটাতে।

সে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। অথচ এ সংকল্প তাহার মনের মধ্যে ছিল না।

গাছ ভরিয়া রাঙা করবী ফুল ফুটিয়া আছে। কয়টা পাকা লেবুর মিষ্ট গন্ধে স্থানটা ভরপুর। শ্রীমন্তের চোখে আবার জল আসিল। তাহার মনে পড়িল গাছটা গিরির স্বহস্তরোপিত। ছোট্ট গৌরী খেলা-ঘরের মাটীর কলসী দিয়া কত জলই না সেচন করিয়াছে ইহাতে!

বসিবার জন্য সে একটু ছায়া খুঁজিতেছিল। দেখিল করবীর বৃহৎ ছায়াযুক্ত তলদেশটা কে যেন পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীমন্ত সেই ছায়াতলে আশ্রয় লইল।

অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাসে ঝরিয়া পড়িল কতকগুলি শিথিল-বৃন্ত ফুলদল। যেন কে ঐ পুরাতন ফুলগুলি আগন্তুকের শিরে বর্ষণ করিতেই

গাছটীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। শ্রীমন্ত সেই ছায়াতলে শুইয়া কত অতীত কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুম ভাঙিল তাহার কাহার ডাকে—

—গোঁসাই ঠাকুর, গোঁসাই ঠাকুর।

শ্রীমন্ত চাহিয়া দেখিল একটা উলঙ্গ শিশু কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

সে শিশুর মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি!

উলঙ্গ শিশু কোমরের গেঁজ্‌লেটার দাড়িতে পাক দিতে দিতে কহিল—

—আমার ওটা খেলা ঘর।

শ্রীমন্ত মিষ্ট স্বরে কহিল—তোমার খেলা ঘর ত' আমি ভাঙি নাই।

মিষ্ট স্বরের আভাষ পাইয়া শিশুটী তাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে বসিয়া গেল। প্রথমেই কহিল—তুমি গাঁজা খাও না গোঁসাই?

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—খাই।

—তা খাও। আমাদের মহারাজ গাঁজা খায় আর বলে—শিবকে জটা, গঙ্গাবারি, আগ্‌ লাগাকে খায় ত্রিপুরারি; হর হর ব্যোম্‌ হর হর ব্যোম্‌ শূলী শম্ভু শঙ্কর—চেৎ চণ্ডী!

শ্রীমন্ত সত্যই আপন পোঁটলা খুলিয়া গাঁজার সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিল। গাঁজা তৈয়ারী করিতে করিতে সে কহিল—কাদের ছেলে তুমি?

—কে জানে? আমার মা ছিল খেপী। হুই সহর বলে সেই গাঁ আছে সেই গাঁয়ে আমাদের বাড়ী।

—বাবা? বাবা নাই বুঝি তোমার?

—তা জানি না আমি।

আবার চুপি চুপি সে কহিল—জান গোঁসাই লোকে বলে আমার বাবার ঠিক নাই।

শ্রীমন্ত নীরবে গাঁজা তৈয়ারী করিতেছিল। আপন মনেই কোন খেয়ালে গান ধরিয়া দিল—

দেখে এলাম শ্যাম, সাধের ব্রজধাম,—শুধু নাম আ—ছে।

গাঁজা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্ত কহিল—শুকনো পাতা কুড়িয়ে আন তো খোকা। খোকা তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল। পাতা কুড়াইয়া আনিয়া কহিল—আমি খোকা কেন হ'ব, আমার নাম নীলকণ্ঠে।

শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—তুমি খুব ভাল ছেলে নীলকণ্ঠে!

সোৎসাহে নীলকণ্ঠ কহিল—আমাকে তোমার চেলা করবে গোঁসাই? আমি খুব ভিক্ষে করতে পারি। খুব জোরে জোরে বলব হর হর ব্যো-ম্ হর হর ব্যো-ম্—ভিক্ষা মিলে মারী!

—আমার সঙ্গে যেতে পারবে তুমি?

—খু-ব। আমি ত' ভিক্ষে ক'রেই খাই। তিন চার কোশ ভিক্ষে করতে চলে যাই বলে। হুই বামদেবপুর, তি-শূলো, আকধারা।

গাঁজা সাজিতে সাজিতে শ্রীমন্ত হাসিয়া কহিল—বেশ আমার সঙ্গে যাবে তুমি।

পরম উৎসাহভরে নীলকণ্ঠ কহিল—কবে যাবে তুমি?

—কাল।

—আজ কোথা থাকবে?

—এইখানে।

ভীত মৃদুকণ্ঠে নীলকণ্ঠ কহিল। এখানে ভূত আছে জান? রোজ কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। শ্রীমন্তের গাঁজাটানা বন্ধ হইয়া গেল। সে নীলকণ্ঠের মুখপানে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল—ঠিক জান' তুমি?

নীলকণ্ঠ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া কহিল—হ্যাঁ গো, কত লোক দেখেছে। সর্বাঙ্গ তার পুড়ে গিয়েছে। কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

শ্রীমন্ত গাঁজা খাইয়া নিঃশব্দে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নিমীলিত দু'টী চোখ হইতে আবার দুইটী জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। পাখীর দল কলরব করিয়া যে যাহার আশ্রয়ের পানে চলিয়াছে। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে দিন মজুরের দল সারি বাঁধিয়া ফিরিতেছে। শ্রান্তকণ্ঠে তাহাদের গান শোনা যাইতেছিল—

দিন কাটিলো খেটে খেটে, রাত কাটিবে ভাঙা ঘরে।

নীলকণ্ঠ কহিল—আমিও তোমার কাছে থাকব সন্ন্যেসী ঠাকুর!

শ্রীমন্ত কহিল—ভয় করবে না?

—তুমি থাকবে যে। আর দু'জন থাকলে ভুত আসবে না।

অকস্মাৎ রূঢ়স্বরে শ্রীমন্ত কহিল—না। যা তুই এখেন থেকে।

নীলকণ্ঠ কহিল—না; তুমি পালিয়ে যাবে।

কোন পরের ছেলের এ আব্দার শ্রীমন্তের ভাল লাগিল না। শিশুটার সান্নিধ্যের জন্য সে যদি দেখা না দেয়!

অতি রূঢ়ভাবে সে কহিল—ভাগ্।

নীলকণ্ঠ সভয়ে দূরে সরিয়া গেল।

প্রহরের পর প্রহর রাত্রি চলিয়াছে। নিস্তব্ধ ধরণী। শুধু রাত্রির রহস্যময় সন্ সন্ শব্দ একটা শোনা যাইতেছিল। শ্রীমন্ত জাগ্রত চোখে বসিয়া আছে ব্যাকুল প্রত্যাশায়। সাশ্রুনেত্রা দগ্ধ-অঙ্গা গিরিকে একবার দেখিবে সে!

সহসা নিকটের আমগাছটার কি একটা শব্দ হইল। শ্রীমন্ত চকিত হইয়া সেই দিকে চাহিল। কোথায় কি?

কোন নিশাচর পাখীর পাখা ঝাড়ার শব্দ।

উপরে নীল আকাশে অগণ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। লেবুর মিষ্ট গন্ধে, কবরী ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণটা যেন উদাস হইয়া যায়! কিন্তু কোথায় গিরি?